অভিশপ্ত অরণ্যে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিজন ভট্টাচার্য

'মনে হচ্ছে একটা ভয়ংকব আতঙ্ক আমার পিছু পিছু ছুটে আসছে এখনও। গত দু-বছর কলকাতায় বসবাস করার থাকতে ট্রেনে ওঠার পর যে-মুহূর্তে মনে হচ্ছিল বোধহয় বেঁচে গেলাম নক্ষত্র নামক গ্রহটির হাত থেকে, তখনই চোখে পড়েছিল ট্রেনের কামরায় লম্বা চেহারাটা। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা দেখেই মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখছিলাম কিছুক্ষণ। সংবিৎ ফিরতে দেখি না, অন্য কেউ। তারপর সারাটা ট্রেনপথ সেই উত্তেজনা, সেই আতঙ্ক। লঞ্চঘাটে পৌঁছে লঞ্চে চড়ার পর যে মুহূর্তে মনে হয়েছিল, যাক, সভ্য জগতের দাঁতনখ পেরিয়ে চলেছি এক নির্বাসনের পথে, হঠাৎই চোখে পড়েছিল জেটির পাটাতন পেরিয়ে বড়ো বড়ো ধাপ ফেলে যে উঠে পড়ছে কাঠের খাঁজ-কাটা সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চের ডেকে, আবাব সেই ত্রাস আর আতঙ্ক। পর মুহূর্তে ভুল ভাঙা।

যে-কারণে কলকাতা ছেড়ে এভাবে পালিয়ে যাওয়া, গত দু-বছর ধরে যে-কালো ছায়াটা তাড়া করে ফিরছিল আমাকে তা যেন এখনও, লঞ্চে উঠে পৃথিবীর বাইরে রওনা দেওয়ার পরও মনে হচ্ছে কোনও দিনই আমার পিছু ছাড়বে না। ঠাসাঠাসি লঞ্চের কেবিনের নিভৃতে বসেও চমকে চমকে উঠছি তার কথা ভেবেই।

তাবপর সারা লঞ্চের প্রতিটি যাত্রীকে খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি, না এই লঞ্চে সে নেই। লঞ্চে ওঠার আগের মুহূর্তেও মনে হয়েছে, কী জানি তার সাঁড়াশি-চাউনি থেকে পালাতে গিয়ে কোথায় চলেছি কে জানে, কিন্তু এখন এক নদী জল আর দু-পারের মাঠখেত, খাঁড়ি আর লোকালয় পার হতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই লঞ্চটা যেন পৃথিবীর বাইরে কোনও জায়গায়, কিংবা গভীর সমুদ্র পেরিয়ে কোনও অজানা জায়গায় গিয়ে নোঙব করে।

বেশ কিছুক্ষণ একনাগাড়ে চলার পর এখন মনে হচ্ছে আমি নিশ্চিন্তে বলা যায় নির্বাসনেই চলে এসেছি কলকাতার কোলাহলময় উল্লাস ছেড়ে। সিদ্ধান্তটা নিতে সময় লাগেনি, কেন না কোনও একজন মানুষের জন্য যদি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে জীবন, সেই মানুষ যার সঙ্গে কাটাতে হয় দিনের বেশিরভাগ সময়, তা হলে সেই বাঁচা আর বাঁচা থাকে না, হয়ে ওঠে না-মরে বেঁচে থাকার মতোই। টানা দু-বছর তার সঙ্গে থাকার পর এক সময় মনে হয়েছিল এর চেয়ে আত্মহত্যা করাই বোধহয় আমার বেঁচে যাওয়া।

তারপর সুযোগ ঘটে গেল আচমকা। কলকাতা থেকে বহু দূরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হয়ে চলে এসেছি এই নিশ্চিন্তপুরে। না, জায়গাটার নাম

নিশ্চিন্তপুর নয়, অন্য কিছু। সেই নামটা না-ই বা উল্লেখ করলাম ডায়েরিতে। যেহেতু কলকাতা থেকে আমার এই চলে আসাটা নিতান্তই স্বেচ্ছানির্বাসন। এতদিনে বুঝতে পেরেছি এমন এক সন্দেহবাতিকতায় সে আক্রান্ত যা কখনও সারবে না। বুঝতে ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনেক দেরি হয়ে গেল। উনত্রিশটি বসন্ত নয়, উনত্রিশটি বর্ষা পার করার পর চলে এলাম সুন্দরবনে।

লঞ্চের কেবিনে বসে দেখতে পাচ্ছি দু-পারে নদীবাঁধ, তার ওপাশে ফসলের মাঠ, আর সাদা জলপরির মতো দেখতে এই ফেরিলঞ্চটা সামান্য নীলচে রঙের জল ঠেলে চলেছে গন্তব্যের দিকে। লঞ্চ ঠিক নয়, এগুলোকে এদিকে বলে ভুটভুটি। অনেকটা বজরার মতো চেহারা, উপরে একটা ছোট্ট কেবিন। ডিজেলে চলে তার ইঞ্জিন। জলের বুক চিরে এই দ্রুতলয়ে ছোটার মধ্যে এক অদ্ভুত নেশা আছে যা এই জলযানটিতে ওঠার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। কতক্ষণ চলেছি তা ঘড়ি দেখে জানতে চাইনি।

জানার প্রয়োজনও মনে করিনি কেন না আমি এখন বাধাবন্ধহীন এক মুসাফির। আহ্, কী যে মুক্তির আনন্দ এখন আমার মনে ও শরীরে তা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না। টানা দু-বছর এক উন্মাদের সঙ্গে ঘর করার পর তার বাঁধন ছিঁড়ে বেরোনো ছিল আমার কল্পনার বাইরে। এখন আমার মুক্তি যেন সেই বিখ্যাত গানের মতো। গাইতে ইচ্ছে করছে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। তাই ভুটভুটির কেবিনে বসে দু-পারের প্রকৃতি দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল আমার ডায়েরিতে লিখে রাখি আমার এই স্বাধীনতা দিবসের খণ্ডমুহূর্তগুলি।

এখনই না-লিখে রাখলে পরে আর হুবহু এরকমটি লিখতে পারব না হয়তো।

আত্মীয়স্বজন-পাড়া-প্রতিবেশী সবাই বারণ করেছিল। সুন্দরবন! ও বাবা। সেখানে পায়ে পায়ে বাঘ। জলে কুমির। চলতে ফিরতে বিষধর সাপ।

কিন্তু কলকাতার জীবন যখন দুঃসহ হয়ে উঠল, তখন সেখান থেকে উনত্রিশ বছরের শিকল ছিঁড়ে পালানো ছাড়া আর কী উপায়! নিশ্চিন্তপুরে এসে হয়তো নিশ্চিন্ত হতেই চেয়েছি।'

ডায়েরি লেখায় ক্ষান্ত দিয়ে বিদিশা বেরিয়ে আসে পাটাতনের উপর। আরও বহু ঘরে ফেরা মানুষ ভিড় করে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

ভুটভুটিতে যাত্রী বোঝাই হয়ে যাত্রা শুরু করেছে তাও আধঘন্টার উপর। জেটিতে অপেক্ষা করছিল অনেকগুলো ভুটভুটি। তাদেরই একটায় চেপে বসে গোসাবার পথে চলেছে এই তল্লাটে নতুন পা-দেওয়া তরুণীটি। জলযানটি যাত্রীতে টইটম্বুর। ক্যাপাসিটির চেয়ে অনেক বেশিই যাত্রী তোলে ভুটভুটিঅলারা। বে-আইনি কাজ, কিন্তু ইদানীং বে-আইনটাই পরিণত হয়েছে আইনে। নইলে--

যাত্রীরাও টইটম্বুর ভুটভুটিতে উঠতে ইতস্তত করছে না যেহেতু এই লঞ্চে না-উঠলে পরের ভুটভুটিতে ওঠার জন্য অপেক্ষা, তাতে শেডহীন জেটিতে রোদ্দুরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে হবে। ইঁটের বাঁধানো ইরিগেশনের বাঁধ ধরে শহরে ফিরে যেতে হলে আবার অকেখানি পথ। অতএব লঞ্চ তো ছাপাছাপি। কিন্তু মাল্লারা তো আর নিশ্চিত হতে পারে না, পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। তাছাড়া বিদ্যাধরীর জলে ভুটভুটি ডুবির পর ঘন ঘন পুলিশ চৌকি হচ্ছে, সেটাও তাদের মাথাব্যথার কারণ।

ভুটভুটিটির এক মাঝি বলছিল, নইলে নাকি পড়তায় পোষায় না এতই বেড়ে গেছে ডিজেল-মোবিলের দাম। তবে বিদ্যাধরী নদীতে প্রচুর যাত্রীসমেত ভুটভুটি ডুবি হয়েছে, তার আতঙ্ক যাত্রীদের মধ্যে যতটা না, তার বেশি মাঝিমাল্লাদের মধ্যে। ভয়টা অবশ্য ভুটভুটিতে ওভারলোডিংয়ের জন্য যতটা না, তার চেয়ে বেশি পুলিশের কারণে। ধরলে হেভি ফাইন। সবটাই ক্যাশে, বিনি রসিদে। মেরিন আইন অনুযায়ী ভুটভুটির ক্যাপাসিটি যা, যাত্রী উঠেছে তার দেড়গুণ। ভুটভুটির পাটাতনে লোক ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত কেবিনের চারপাশে মালপত্র সমেত থইথই করছে লোক। এরকম বরাবরই যায়। কী আর করবে! বহুক্ষণ পরে পরে ভুটভুটি, একটা ফেল করলে আরেকটা পেতে চিত্তির।

ভুটভুটির কেবিনে বসে বিদিশা চোখ রাখছিল সামনের নদীর বুকে। রোদ চলকে উঠছে জলের স্তরে যদিও রোদ তেমন আহামরি নয়। চিকচিক করছে সুন্দরবনের এক নদীর বিপুল জলরাশি।

প্যাসেঞ্জারদের মুখে শুনছিল আজকের তিথি চতুর্দশী। এ দেশে দিন শুরু হয় তিথি গুণে, চতুর্দশী মানে কোটাল। ভরা কটালের জল যেমন বাড়ে, উঁচুও হয় বাঁধের কাঁধ ছুঁই ছুঁই, তখন ভুটভুটি ছাড়লে স্রোতের টানে এগুবে না বেশি। তাই অপেক্ষা করে ভাটার। ভাটা পড়তেই জলের টানে টানে জলযানের পাড়ি শুরু করে। ছুটতে শুরু করে হু হু।

কত ঘোড়ার মেসিন যেন মাল্লাটি বলছিল, তাই গতিও তেমন, জলের বুক কেটে ফেলা ছড়িয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় বিভিন্ন স্টপেজ।

প্রপেলারে ঘূর্ণি তুলে জলের ফেনা কেটে এগিয়ে চলেছে ভুটভুটি। বিদিশার তুঁতে রং শাড়ির আঁচল উড়ছে নদীর হাওয়ায়। ভুটভুটিতে ওঠার সময় বিদিশার হাতে ছিল একটা সুটকেশ, কাঁধে একটা ব্যাগ। সুটকেশটা রেখেছে কেবিনের ভিতর। ব্যাগটা কাঁধেই রয়ে গেছে ওয়ার্কিং লেডিদের যেমন থাকে অফিসে বা বাইরে যাওয়ার সময়।

এক-একটা স্টপেজ আসে, আর লোক নামা-ওঠা করে, মোট নিয়ে নামে, মোট নিয়ে ওঠে। সুন্দরবনের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এইসব ভুটভুটির গতিবিধি,

ভুটভুটি জেটিতে ভিঁড়লে আসবে আনাজপত্র, তরিতরকারি—এখানে তেমন শাকসব্জির চাষের চলন নেই সেচের জলের অভাবে, যা কিছু উৎপন্ন হয় প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য, ফলে চালানি আনাজ আসে ভুটভুটিতে। আরও আসে পরার লুঙ্গি, ডুরে শাড়ি, ধুতি, শার্ট। আসে কসমেটিক্স্, ছাতা, খবরের কাগজ ইত্যাদি।

বিদিশার জীবনে চাকরি এই প্রথম। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ও ভাইভা ভোসি দিয়ে আরও পাঁচজন প্রার্থীর মতো, 'ও হবে না, আমার তো উপরে জানাশুনো নেই' বলে মনমরা, সেসময় তাকে অবাক করে স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে তার সাফল্যের চিঠি। চিঠি পেয়েও সে ছিল নিশ্চেষ্ট, সে যখন ভাবছিল 'অতঃ কিম? তখনই পাখির আলয় গার্লস হাইস্কুল থেকে সরাসরি নিয়োগের চিঠি।

সবটাই তার মনে হয়েছিল অলৌকিক ও অবাস্তব। কিন্তু চাকরি পাওয়ায় যেমন আনন্দ, তেমনই নিয়োগপত্রে 'পাখির আলয় ...' লেখা দেখে নিরানন্দ। তার উপর তার স্বামী যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি ছিঁড়ে এক লাইন কবিতা আওড়াল, 'শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর', তখন বিদিশা মরিয়া হয়ে ঝাঁপাল চাকরি তাকে করতেই হবে।

কলকাতার জীবনে এ হেন জীবনমরণ সমস্যা না-থাকলে হয়তো তাকে চাকরি করতে হতও না। কিন্তু এখন এই বেলা এগারোটার সময় নদীর বুকে উধাও হওয়ার মুহূর্তে মনে হচ্ছে সাকার হওয়ার যে এত সুখ তা কখনও আন্দাজও করতে পারেনি।

একজন মাঝি হঠাৎ তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যেন নামবেন বললেন?

বিদিশা নাম বলে।

—এখনও দেরি আছে। ভিতরে গিয়ে বসুন।

বিদিশা লোকটার কথা গ্রাহ্য করার কথা মনে রাখল না, বরং চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে দুপাশের নদীবাঁধ, তার উপর কোথাও একঠেঙে তাল বা নিরিবিলি বাবলা গাছের সৌন্দর্য অসম্ভব লাগছিল। কোথাও একটেরে ঝুপসি জঙ্গল, তাতে ঠেস দিয়ে দুটো মুখোমুখি বক।

কয়েকঘন্টার পথ, সুন্দরবনের মানুষ কলকাতায় কাজকর্ম সেরে ফিরে যাচ্ছে নিজের গাঁয়ে, ডেকের উপরে এক-এক জায়গায় তারা জটলা করে যে-যার অভিজ্ঞতা জাহির করে। ফুক-ফুক করে বিড়ি টানে আর গল্প করে নতুন দেখা সিনিমার, অথবা হাইকোর্টের উকিলের সাথে নানাবিধ আলোচনার। সে-সব অভিজ্ঞতা নববধূর সঙ্গে প্রথম রাত্রির কথোপকথনের চেয়ে কিছুমাত্র অগুরুত্বপূর্ণ নয়, আলোচনা করতে করতে তাদের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ট্রেনে যেমন থাকে রকমারি হকার, তেমনই সচকিত করে হঠাৎ হঠাৎ হেঁকে যাচ্ছে কেউ। 'চা-গরম', হাতে তার গরম কেটলি ও মাটির খুঁার। ছোলা-বাদামওলা প্যাকেট বিক্রি করছে পনেরো বা কুড়ি পয়সায়, একজন তো গোটা গোটা আপেলই দিচ্ছে সাড়ে তিনটাকা কেজি দরে। অনেকক্ষণের জার্নি, বিক্রিও হচ্ছে হু-হু করে। চুপচাপ বসে না থেকে কেউ কেউ টুকটাক মুখ চালানোই শ্রেয় মনে করেন।

ক্রমে সরু হয়ে আসে নদী, নদীর বিশাল চেহারা বিশালতর হয়ে ওঠে দুই নদী মুখোমুখি হলে, তারপর গোমর নদীতে ঢুকে পড়লে খানিকটা থিতি, মাঝে মাঝে দুপাশে ক্যাওড়া ও বাইনগাছ, আর নীল আকাশের ছায়া নদীর বুকে ঝাঁপ দিয়ে এক নতুন আনন্দে তার শরীর কাঁপাচ্ছে। এইসব নদীই বর্ষায় হয়ে ওঠে ভীষণ, ফেঁপেফুলে একাকার, তখন ঘনঘন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে টাল যায় জলযানটি।

ভুটভুটির ঢেউয়ে পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া পালতোলা নৌকোয় উঠছে কাঁপন, কাঠ ও বাঁশের পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত করে ধরা হালের মাঝি একমুহূর্ত থামে, বুঝি সে সামলায় ঢেউয়ের দোলা, আর দাঁড়ি চারজন ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে একমুহূর্ত কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে দেখে ভুটভুটির লোকজন, দেখতে দেখতে অতিক্রম করে যায় দৃষ্টি।

ভারিক্কি চেহারার এক ব্যাক্তি হঠাৎ পাশে এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এখানে নতুন আসছেন?

বিদিশা ঘাড় নাড়ে।

—কোথায় যাবেন?

বিদিশা লোকটার দিকে চোখ রেখে বোঝার চেষ্টা করে লোকচার হাবভাব। হঠাৎ বলল, আমি এখানে টিচার হিসেবে জয়েন করতে এসেছি।

লোকটি চমকে উঠে বলল, কোন স্কুলে? পাখিরালয় নাকি?

বিদিশা সাগ্রহে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। পাখির আলয় গার্লস হাই স্কুল।

লোকটি কীরকম মুখ করে তাকায় বিদিশার দিকে। হঠাৎ বলল, কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা।

—কলকাতা থেকে এতদূরে আসছেন মাস্টারি করতে?

বিদিশার ভুরুতে কোঁচ পড়ে। লোকটিকে পরখ করে। কিছু বলে না।

—ভূ-ভারতে এত স্কুল থাকতে হঠাৎ এখানে এলেন কেন?

বিদিশা বিরক্ত বোধ করে, বলে, স্কুল সার্ভিস কমিশন যেখানে পোস্টিং দিয়েছে সেখানেই তো আসতে হবে। নিজের ইচ্ছেয় তো আর পোস্টিং পাব না!

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটু সাবধানে থাকবেন। জায়গাটা ভালো নয়। নতুন এসেছেন তো, তাই বলা। নইলে আমার কী!

বিদিশার কপালের ভাঁজে এক চামচ আশঙ্কা ও এক হাতা বিরক্তির মিশেল। গায়ে পড়ে সতর্ক করে দেওয়াটা পছন্দ হল না যদিও নতুন জায়গায় যাওয়ার মুহূর্তে একটা টেনসন তার ভিতরে বইছে অন্তঃসলিলার মতো।

বিদিশা ফিরে আসে তার কেবিনের সিটে। ডায়েরির পৃষ্ঠা খুলে আবার লিখতে বসে :

'ভুটভুটিজার্নি আমার জীবনে এই প্রথম। নীচে বসার ব্যবস্থাই বেশি, সেখানে ভাড়া কম। উপরে পাটাতনের উপর অনেকেই মালপত্র নিয়ে বসে। কেবিনের ভাড়া আর একরকম, কেবিনে অবশ্য বসা যায় ভালো ভাবে, দেড়া ভাড়ায় চারদিক খোলামেলা, আরামও বেশি, তা ছাড়া দেখা যায় ভাটার টানের খরস্রোত, আর দুপাশের বাঁধ বরাবর হেঁতাল ও গেঁয়োর ঝোপ। কোথাও চালাঘরের রকমারি কারুকার্য, তাও বা কম কীসে! দেখতে দেখতে যাওয়া যায় বেশ। রকমারি লোক পাটাতনের উপর ডাঁই করেছে মালপত্র, কলকাতা বাজারের জিনিসপত্র যাবে গোসাবার বাজারে। ফিরছে কলেজের ছেলেরা যার-যার গাঁয়ের দিকে। কারও হাতে লিফলেট। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল একজিবিশন, যাত্রা আর কবিগান করাবে গোসাবা থেকে আটমাইল হাঁটা পথে মাতঙ্গপুর, নিজের গাঁয়ে, তারই লিফলেট বিলোচ্ছে যাত্রীদের কাছে। সুন্দরবন ভ্রমণের যাত্রীও দু-চারজন। ক্যামেরা, ফ্লাস্ক, জলের বোতল আর কিটস্ ব্যাগ সব হইহই করে জড়ো করে রেখেছে পাটাতনে।'

অনেকটাই নিবিষ্ট ছিল ডায়েরির পৃষ্ঠায়, হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে চমকে তাকায় বিদিশা। খালাসিটা কেবিনে মুখ বাড়িয়ে বলছে, ম্যাডাম, আপনার স্টপিজ যে পেরিয়ে যায়।

বিদিশা তাড়াতাড়ি হাতে বাক্স, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসে ডেকের উপর। ভুটভুটি তখনও ফেনা কেটে চলেছে ভটভটিয়ে। তার ঢেউ কাঁকরি-কাটা থালার মতো গিয়ে ঠেক খাচ্ছে কিনারে। বিদিশা একবুক কাঁপ নিয়ে লক্ষ করছিল তার স্বেচ্ছানির্বাসনের গন্তব্যটি ঠিক কী রকমের! নদীবাঁধ পেরিয়ে চোখে পড়ছে ছোট্ট একটি লোকালয়। কিছু পাকা ও কাঁচা বাড়ির সমাহার। কাঁচাই বেশি, সেইটেই স্বাভাবিক।

একটু পরেই ভুটভুটি এসে ভিড়ল নদীর কিনারে। ভুটভুটির সিঁড়ি ঘাটে লাগাতেই লোকটি নেমে দ্রুত চলে গেল তার গন্তব্যে। বিদিশা তার চলার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একজন খালাসি এসে তাড়া দেয়, কই নামুন। ভুটভুটি ছাড়তে হবে যে!

বিদিশা খালাসির এগিয়ে ধরা লগি ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সাবধানে। কাঠের জেটিটা সাতপুরোনো। যে কোনও দিন ভেঙে ভেসে যাবে নদীর জলে। তবু আপাতত তো পৌঁছোন গেল!

জেটি থেকে ভুটভুটি ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে কিনারের মাটিতে। যেই না ভুটভুটি একটু একটু করে আড়াল হল চোখের, বিদিশার বুকে কিছুক্ষণের জন্য ঘোর হা হা শূন্যতা।

২

আজ ছুটির দিন নয়, স্কুল-ডে, তবু একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে যে-একতলা স্কুলবাড়িটির সামনে সে এসে পৌঁছোল সেটির দরজা বন্ধ। অর্ধেক প্লাস্টার করা তো অর্ধেক ইঁট-বেরোন। স্কুলের দরজা বন্ধ দেখে কিছুক্ষণের জন্য থমকায় তার একমাত্র হৃৎপিণ্ডটি। সামনে দাঁড়িয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই একজন মালিগোছের লোক এসে জিজ্ঞাসা করে, কাকে চাইছেন?

--স্কুল কি বন্ধ?

--হ্যাঁ। মন্ত্রী মারা গেছে তো! কাল টিভিতে বলেছে, তাইই বড়দি বললেন—

- বড়দি কোথায়?

- বড়দি তো হোস্টেলে। আপনে দেখা করবেন?

বিদিশা তাকে কিছু বলে। লোকটি চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, ও, আপনে নতুন দিদিমিণি? আসুন আসুন। বড়দি বলছিলেন নতুন একজন দিদিমিণির অর্ডার হয়েছে।

বিদিশার কৌতূহল হয়, আপনি কে?

—আমি বনমালী। বাগানের মালি।

বাগানটা এক নজর চোখ পেতে বিদিশা বুঝল মালির এলেম কত! প্রায় ন্যাড়া একটি বাগান পোষার জন্য একজন আস্ত মালির কী দরকার!

সে বিষয় ক্রমশ বিবেচ্য। অতএব লোকটির, মানে বনমালীর পথনির্দেশ অনুযায়ী বিদিশা আর একটু ঘুরে গিয়ে পৌঁছোয় স্কুল থেকে মিনিট পাঁচেক দূরের হোস্টেলে। পাকা দেওয়াল, টিনের ছাউনি, লম্বা একঢালা হোস্টেল। মালির ডাকাডাকিতে বেরিয়ে আসেন একজন মাঝবয়সী মহিলা। শিক্ষিকা-শিক্ষিকা চেহারা। বিদিশা ব্যাগ খুলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের একটি কপি বার করে দেখায় তাকে। সঙ্গে সঙ্গে চশমাপরিহিতা বেশ হইচই করে বলেন, ও, আপনিই বিদিশা সেন? আমি ঐশী মুখার্জি।

বিদিশা হাসি-হাসি মুখে তাকায়।

ঐশীদি ততক্ষণে ডাকাডাকি করে ডাকেন অন্য শিক্ষিকাদের। ঐশীদি ছাড়াও হোস্টেলে থাকেন আরও চারজন টিচার। বড়দি তো তাকে পেয়ে খুশিতে ডগোমগো। বললেন, এত কম টিচারে কাজ করতে হয় না! একজন না এলেই তো কত ক্লাস অফ। এভাবে স্কুল চালানো যায়! তুমি এসে ভালোই হয়েছে। আমরা তো বলাবলি করছিলাম সুন্দরবনে পোস্টিং শুনে হয়তো জয়েন করবে না।

বিদিশা বলল না তাকেও সবাই পইপই করে বলেছিল জয়েন না করতে। বলেছিল আর এক বার পরীক্ষা দিলেই হয়তো কাছে পোস্টিং হবে। কিন্তু তার তো কলকাতা থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে বলেই এই বনবাস।

--তারপর, এই হলেন ঐশীদি, এই হল লালিমা, এই ছন্দিতা , এই পৃথা....

আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হলে বড়দি বললেন, ঐশী, তোমার পাশের ঘরটিই ফাঁকা পড়ে আছে। রসমতী বোধহয় পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে রেখেছে। তুমি ওকে ঘরটা দেখিয়ে দাও। রসমতীকে বলো দুপুরের জন্য আরও দুমুঠো চাল হাঁড়িতে নিতে। এখন দেখো তো, ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। সেই কখন বেরিয়েছে কলকাতা থেকে। তারপর একটু বিশ্রাম করুক। পরে ভালো করে আলাপ-পরিচয় হবেখনে।

ঐশী নামের মাঝবয়সী শিক্ষিকাটি বিদিশাকে নিয়ে যায় একটি তালা দেওয়া ঘরে। রসমতী ততক্ষণে খুলে দিয়েছে বন্ধ ঘরের দরজাটা। সেদিকে দেখিয়ে ঐশীদি বলেন, এই হল আপনার ঘর।

বিদিশা হেসে বলে, আমাকে তুমিই বলবেন।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রথম দিন তো।

ঐশীদি চলে যেতেই কিছুক্ষণ একদম একা হয়ে গেল বিদিশা। নতুন পরিবেশে নতুন ঘরে একা হয়ে যাওয়ায় বুক ঢিপঢিপ করে তার। ঘুরে ঘুরে দেখে ঘরের চারদিক। ছোট্ট একটি খাট। পাশে একটি ছোটো টেবিল। একটি চেয়ার। একটি ছোটো ড্রেসিং টেবিল। সবই সস্তা দামের।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে বলাই ছিল পাখিরালয় বালিকা বিদ্যালয়ে হোস্টেল আছে। ইচ্ছে করলে শিক্ষিকা সেই হোস্টেলের ঘরে থাকতে পারবেন। এই কথাটা লেখা ছিল বলেই বিদিশার পক্ষে স্কুলে জয়েন করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়েছিল আরও। না-থাকলেও হয়তো চলে আসত মা দুর্গা বলে। তার তো কলকাতার বিষ ছেড়ে বেরোন দরকার তখন।

একটু পরেই তার ঘরে আসে সেই মাঝবয়সী মহিলা। বলে, দিদি, আমি রসমতী।

—রসমতী ! একটু অগেই নামটা শুনেছে বড়দির মুখে। তবু বলল, বাহ্ বেশ নাম।

-আমি হোস্টেলের সব ঘরে কাজ করি।

--তা সব ঘরে যখন কাজ করো, আমার ঘরেও করবে।

রসমতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমি রান্নাও করি। আপনি রাতে ভাত খান, না রুটি ?

--ভাত।

রসমতী আগেই ঝাড়াপোঁছা করেছিল ঘরটা, বিদিশা তার নিয়োগ অনুমোদন করতে আবার ঝাঁট দিতে থাকে । বিদিশা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে, স্ক্রিনের উপর সিগন্যাল দেখে লাফিয়ে উঠে বোতাম পুশ করতে শুরু করে, একটু পরেই, মা, বিদিশা বলছি। এই নম্বরটা আমার নতুন মোবাইলের। পুরোনো জীবন ছেড়ে নতুন জীবনে ঢোকার আগে পুরোন জীবনের মতো পুরোনো মোবাইলটাও ফেলে দিয়ে এসেছি। এই নতুন নম্বরটা টুকে রাখো। না, আর কাউকে দেবে না এই নম্বরটা। আর হ্যাঁ, এই একটু আগেই পৌঁছে গেছি স্কুলে। হ্যাঁ হ্যাঁ। কোনও অসুবিধে হয়নি। এখানে হোস্টেলে আমার জন্য একটা আলাদা ঘর আছে। বাবা খুব চিন্তা করছিল, বলছিল বিদিশা সুন্দরবনের নদীনালা পার হয়ে বিজিতপুরে যেতে পারবে না। নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমাদের মেয়ে এখন বড়ো হয়ে গেছে। বুম্বাকে বোলো দিদি ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে। ও তো খুব ভয় দেখাচ্ছিল সুন্দরবনে মানুষ থাকে না, শুধু বাঘ আর সাপ। না, না, সেরকম কোনও ব্যাপারই নেই। ফার্স্ট ক্লাস জায়গা। কী সুন্দর স্কুল। হোস্টেলে আমি ছাড়াও পাঁচজন টিচার। দুজন তো আমারই বয়সী। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ঘর। হেডমিস্ট্রেসও খুব ভালো। ...

মোবাইল বন্ধ করে বিদিশা কিছুক্ষণ বসে থাকে খাটের উপর। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরোয়। টানা লম্বা বারান্দা থেকে দেখা যায় গ্রামের পথ, সেই পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেকটা। হঠাৎ দুভাগ হয়ে হঠাৎ একটি চলে গেছে সম্ভবত গ্রামের দিকে, অন্যটি নদীবাঁধের দিকে। বারান্দা থেকে নদী দেখা যায় না নদীবাঁধটির উচ্চতার কারণে। বিদিশার একটু আপশোশ হল কেন বারান্দা থেকে নদীর চেহারা দৃশ্যমান হল না, তা হলে সকালে ঘুম থেকে উঠেই নদী দেখে মন ভালো করে নিতে পারত রোজ রোজ।

আশৈশব কলকাতায় মানুষ যে-মেয়েটি, হঠাৎই সেখান থেকে যাকে বলে উৎপাটিত হয়ে সুন্দরবনের এক দুর্গম জায়গায় জীবনযাপন কীরকম হবে তা নিয়ে ভাবিত হল কিছুক্ষণ। মা যখন বারবার বলছিলেন, 'তুই সেখানে গিয়ে থাকতে পারবিনে', বিদিশা জোর দিয়ে বলেছিল, কেন পারব না। মেয়েদের অস্তিত্বের শিকড় খুব আলগা হয় কেন না তারা জ্ঞান হওয়ার পর থেকে জেনে যায় বড়ো হলেই তার বিয়ে হয়ে যাবে. বিয়ে হলেই তাকে বাপের বাড়ির পাট চুকিয়ে শিকড় মেলতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে।

--কিন্তু তোর তো বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আবার নতুন করে--

--মা, ধরে নাও আমার এই বিয়েটা বিয়ে নয়, আমি কোনও অপরাধ করেছিলাম, তার শাস্তি হিসেবে আমাকে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল এক উন্মাদের সঙ্গে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা আমার পরিশ্রমে খুশি হয়ে আমাকে সেই যাবজ্জীবন থেকে মুক্ত করে দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সুন্দরবনে। দেখিই না কতটা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। যদি খুব অসুবিধে না হয়--

--তা ছাড়া মা, আমাকে কলকাতা থেকে পালিয়ে যেতেই হবে, নইলে আমি বাঁচতে পারব না। তবে আমার ইচ্ছে আছে আর একবার পরীক্ষা দেওয়ার। যদি তাতে কলকাতার কাছাকাছি কোনও পোস্টিং পাই তো--

যদির কথা আপাতত সামনের নদীতে বিসর্জন দিয়ে বিদিশা ভাবতে বসল তার এই নতুন জীবনযাপন কেমন হবে। একেবারে অচেনা পরিবেশ, অচেনা মানুষজন। তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চাকরি করতে হবে, চাকরিটা তার খুব পছন্দের। কিছু অচেনা ছোটো ছোটো মেয়েদের পড়াতে হবে এই ভাবনাটাই তার খুব রোমান্টিক মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। দু-বছর বিয়ের পরও কেন তার বাচ্চা হচ্ছে না এই ভাবনা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল তার মাকে। সে বলতে পারেনি তার গোপন রহস্য। এখন তার কাছে ঘুরঘুর করবে অনেক বালিকা, অনেক কিশোরী।

কিছুক্ষণ নিজেকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করে সে ফিরে এল তার ঘরে। ব্যাগ-বাক্স খুলে প্রথমে সাজিয়ে নিতে হবে তার ছোট্ট সংসার। সে খুলে বসল তার কলকাতা থেকে বয়ে আনা কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী।

৩

হোস্টেলের দেওয়াল ঘড়িটা দু-বার ফিসফিস করে হেসে উঠতেই পৃথার সুন্দর মুখটা টপকাল প্রধান শিক্ষিকার ঘরের চৌকাঠ, সুরেলা গলায় বলল, বড়দি, দুটো বাজল, খেতে আসবেন না?

হোস্টেলে বড়দি শাশ্বতী মিত্র ঘসঘস করে কী যেন লিখছিলেন একটা সবুজ ডায়েরিতে, মুখ তুলে বললেন, তোমরা ডাকলেই যাব।

--শিগগির চলে আসুন। পেটে রয়েল বেঙ্গল খোঁচাখুঁচি করছে।

--রয়েল বেঙ্গল কি তোমার একার সম্পত্তি! আমার পেটেও তো জাগছেন তিনি। সবাই এসে গেছে?

--না, ছন্দিতাকে তো সকাল থেকেই দেখছিনে।

--তাই নাকি? কাউকে কিছু বলে যায়নি?

--না। আপনি আসুন। আমরা খেয়ে নি। ছন্দিতা এলে--

ছন্দিতা আজই যে এরকম না-বলে উধাও হয়েছে তা নয়। গত দু-তিন বছর তার চলনেবলনে এক অন্য কুয়াশা যা স্কুলের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে তাকে নিয়ে বিজিতপুরে একটা স্ক্যান্ডাল ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে স্কুলের সেক্রেটারি নিমেষ মিত্রকে নিয়ে। তাঁরই প্রশ্রয়ে ছন্দিতার এই অব্যাকরণীয় স্বভাব ও চালচলন।

ডায়েরিটা বন্ধ করে টেবিল থেকে উঠে পড়লেন প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী মিত্র। চোখের চশমাটা খুলে ভরলেন খাপের ভিতর। ভুরুতে গোমরনদীর ঢেউ তুলে অপেক্ষমান পৃথার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছন্দিতাকে একদিন ভালো করে বোঝাতে হবে যা করছে তা ঠিক নয়। এটা একটা গার্লস স্কুল। বড়ো বড়ো মেয়েরা সবই বোঝে।

পরক্ষণে দরজায় শিকল টেন দিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। ভুরুর ভাঁজে ইস্ত্রি টেনে দিয়ে পরক্ষণে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন পৃথার দিকে, ছুটিটা সোমবার-টোমবার হলে তোমাদের কারও কারও সুবিধে হত, তাই না?

পৃথা খুশিতে ডগোমগো হয়ে বলল, যা বলেছেন, বড়দি। আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলি, মন্ত্রী যখন পরশুর আগেব দিন মারা গেছেন, আর তাঁর মৃত্যুর জন্য ছুটি হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার, তখন আর তিনদিন পবে দিলেই তো আমরা কলকাতায় একদিন বেশি থাকতে পারতাম।

—ইস, তোমাদের আবদার আর ধরে না!

—কেন, আবদার কীসের? আপনি কবে ছুটি দিচ্ছেন না দিচ্ছেন তা তো আব কেউ এই যমের দক্ষিণ দোরে এসে দেখতে যাচ্ছে না!

শাশ্বতী হাসলেন, তোমাদের সুবিধে দেখে ছুটি দিলে আর দেখতে হবে না। কখন কোন সাংবাদিক সংবাদের খোঁজে সুন্দরবনে ঘুবতে এসে স্কুল বন্ধ দেখে একটা ভালো স্টোরি করে দিলেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। তা ছাড়া কিছু স্থানীয় সংবাদদাতাও তো কম যান না।

সবাই জানে পাখির আলয় গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী মিত্র খুব নরম স্বভাবের মানুষ। স্কুলে সারাক্ষণ কোনও না কোনও হুজ্জুতি লেগেই আছে, কিন্তু রাগারাগি করেন কালেভদ্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী, পড়েছিলেন কেমিস্ট্রি নিয়ে। কিন্তু কিছুটা তাঁর নিজের ইচ্ছেতেই তাঁকে হেডমিস্ট্রেস হয়ে চলে আসতে হয়েছে সুন্দরবন এলাকার এই বিদ্যালয়ে। শুনেছেন এ সব এলাকায় এককালে জঙ্গল ছিল, তৎকালীন জমিদারদের উদ্যোগে ও ইংরেজ সরকারেব সহায়তায় জঙ্গল কেটে তৈরি হয়েছে বসত। কিছুকাল আগেও এ সব জায়গা ছিল খুবই দুর্গম, ইতিমধ্যে জলযানের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, তেমনই রাস্তা তৈরি হয়ে

যাতায়াতের ব্যবস্থাও আগের চেয়ে অনেক ভালো। তবু যে-এলাকায় জলপথ ছাড়া আসার কোনও উপায়ই নেই, তা শহরের মানুষের কাছে আজও দুর্গমই।

কিন্তু সেই সুন্দরবনে শিক্ষকতা করতে এসে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে শাশ্বতী মিত্রর সুনাম। একদিকে চেষ্টা করেন স্কুলের পড়াশুনোব মান উন্নয়নে, অন্যদিকে সবার সঙ্গে মানিয়ে, প্রচ্ছন্ন অভিভাবিকার মতো স্কুল চালাতে। কিন্তু স্কুলে পড়ানো এক রকম, আর প্রশাসক হওয়া আর এক রকম।

আজকের ছুটি দেওয়া নিয়েই কত কথা চালাচালি, কত মত বিনিময় হল যে, তাব ধাক্কা সামলে পুরো ছুটি দিতে বাধ্য হলেন শেষ পর্যন্ত। বছর চল্লিশ আগে মন্ত্রী ছিলেন এমন একজনের মৃত্যুসংবাদ টিভিতে শুনেই টিচারদের কেউ কেউ বলল, বড়দি, কোনও এক্স-মন্ত্রী মারা গেলে ছুটি মাস্ট।

শাশ্বতী অবশ্য পুরোদিনের ছুটি মঞ্জুর করার ঘোবতর বিবোধী। বলেছিলেন, এক্স মন্ত্রীর জন্য কিন্তু হাফ ডে।

কিন্তু হোস্টেলের টিচারদের চাপ তো ছিলই, যে টিচাররা কেউ তিন কেউ চার কিলোমিটার হেঁটে, ফেরিনৌকোয় পার হয়ে 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করেন তাঁদেব দাবি, বড়দি, কষ্ট করে যদি এত দূর আসতে পারি, তা হলে আব হাফ আর ফুলের পার্থক্য কী রইল? কাল পুবো ছুটি দিয়ে দিন। পরের মন্ত্রী মরলে না হয় ছুটি দেবেন না। ফুল স্কুল করব।

খুবই হাস্যকব যুক্তি। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে যুক্তি কোনও নিয়মের ধার ধাবে না। এমনকী সেক্রেটাবি নিমেষ মিত্রও খবর পাঠালেন স্কুলে যেন ফুল ছুটিই হয়। এই মন্ত্রী নাকি দেশের অনেক উপকার টুপকাব করেছেন।

বড়দি অতএব জনমতেব চাপে পুরো ছুটির নির্দেশিকা জারি কবেছিলেন স্কুলে। তাতে ছাত্রীরাও প্রবল উল্লসিত।

ছাত্রী-শিক্ষিকা উভয়েই যেখানে খুশি, প্রধান শিক্ষিকা কী আর করতে পারেন। সবাই চেপে ধরল সুন্দরবনের কোন স্কুলে পুরো ছুটি হচ্ছে, না হাফ তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়!

ছন্দিতা সকাল থেকে হোস্টেলে নেই জেনে শাশ্বতীর ধারণা হল ছন্দিতার এই আকস্মিক অনুপস্থিতির সঙ্গে নিমেষ মিত্রর চাপ দিয়ে স্কুল ছুটি করানোর সঙ্গে নিশ্চিত কোনও একটা যোগসূত্র।

নিমেষ মিত্রর সঙ্গে ছন্দিতার একটা 'আনহোলি অ্যালায়েন্স' আছে তা সর্বজনবিদিত। তার ফলে ছন্দিতার সামনে সবাই কথা বলে বেশ লুকোছাপা করে নইলে কোন কথা সেক্রেটারির কানে চলে যায় সেই ভয়ে সবাই ভূতগ্রস্ত। ছন্দিতা খাওয়ার টেবিলে নেই বলে আজ সবাই একটু স্বস্তিতে।

উইক ডে তে খামোখা একটা ছুটি পাওয়ায় আজ খাওয়ার টেবিলে কিছু অতিরিক্ত হইচই। উইক ডে-তে সবাই স্কুলে যাওয়ায় তাড়ায় তেমন উপভোগ করতে পারে না দুপুরের খাওয়াটা। রবিবারেও তাই কেন না শনিবার বিকেল হলেই কেউ-কেউ কলকাতায় পাড়ি দেওয়ায় রবিবারের দুপুরটাও তেমন জমে না খাওয়ার টেবিলে। আজ ছন্দিতাবিহীন ফুলহাউসে তাই সবাই বিগলিত, হাস্যমুখর। তার উপর নতুন অতিথির আগমনে হোস্টেলের নতুন অতিথি বিদিশা, তাকে নিয়ে সবাইকার এক অন্য উৎসাহ। রসমতী প্লেটে-প্লেটে ভাত-ডাল বেড়ে দিতেই লালিমা বলল, কী রসমতী, নতুন গেস্ট এসেছে তোমার ক্যাটারিংয়ে, ভালো কিছু রান্না করোনি?

রসমতীর চটপট জবাব, সময় আর পেনু কোথায়, দিদি? কাল সকালে বাজারে গিয়ে ভালো মাছ কিনে আনব।

আব কাল? কাল কি আর ছুটি থাকবে? তখন সবার স্কুলে যাওয়াব তাড়া।

শাশ্বতী খেতে খেতে তাকাচ্ছিলেন বিদিশার দিকে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘর পছন্দ হয়েছে তো, বিদিশা?

বিদিশা হ্যাঁ-বোধক ঘাড় নাড়তেই পৃথা হেসে বলল, কেন, বড়দি, পছন্দ না-হলে আপনি অন্য কোনও ঘব দেবেন নাকি?

লালিমা অমনি বলল, দ্যাখো পৃথা, বড়দি ভালোমানুষ বলে তুমি তাকে খোঁচা দিয়ে কথা বোলো না।

মোটেই খোঁচা দিয়ে কথা বলছি না। আমি মজা করছি। আমাদের যা হোস্টেল, তাতে বাস করাই মুশকিল। ভালো আর খারাপ।

শাশ্বতী হেসে বললেন, আমি মোটেই পৃথার কথায় রাগ করছি না। এবার সেক্রে-টারিকে বলতেই হবে বর্ষাব আগে চাল মেরামত না-করলে আর চলবেই না।

ঐশী খাচ্ছিলেন মুখ নিচু করে, মুখ তুলে বললেন, সেক্রেটারিকে বলে কিছু লাভ হয়? গেল বছর কি কম বলেছি আমরা। আমার ঘরে তো চারটে বাটি পাততে হয় বৃষ্টির জল সামলাতে। নইলে সারা মেঝেয় জলে জল। গেল বছব একদিন স্কুল থেকে ফিবে দেখি ঘব না তো সমুদ্র।

লালিমা অমনি বলল, তুমি বললে তো হবে না! সেক্রেটাবির স্নেহভাজন হতে হবে, তবেই তার কথায় কাজ হবে।

শাশ্বতীর কান এড়াল না লালিমার কথার খোঁচা। পলকে বুঝে গেলেন তাঁকে এখন কথার বাঁক ঘোরাতে হবে অন্যদিকে। বললেন, রসমতী দিনদিন ভালো রাঁধছে তাই না? আজ ট্যাংরামাছটা যা রেঁধেছে!

পৃথা বলল, রসমতী। তোমার চাকরি পার্মানেন্ট হয়ে গেল যে! স্বয়ং বড়দি তোমার রান্নার প্রশংসা কবছেন!

শাশ্বতী তাকালেন হোস্টেলে আজই প্রথম আসা বিদিশার দিকে, বিদিশা, তুমি কিন্তু এখনও আড্ডায় যোগ দাওনি?

বিদিশা তার খাওয়ায় বোধহয় একটু বেশি মনোযোগ দিয়েছিল, মুখ তুলে বলল, বড়দি, যে কোনও নতুন পরিবেশে প্রথম কয়েকদিন শুধু অবজার্ভ করতে হয় কে কীরকম মানুষ, কে কী পছন্দ করেন, কার কথার ধাঁচ কীরকম! নইলে কী বলতে কী বলব তখন হয়তো সমস্যা তৈরি হবে। আগে প্রত্যেককে ভালো করে চিনে নি।

শাশ্বতী হেসে বললেন, তা হলে বলতেই হবে তুমি বেশ চালাক মেয়ে। অবশ্য চালাক না হয়েই বা কী উপায়! যা দিনকাল পড়েছে তাতে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হয় প্রতি মুহূর্তে। সে যাই হোক, তা হলে বরং তোমার সম্পর্কে কিছু জানি।তুমি নতুন এসেছ, কোথায় তোমার বাড়ি, বাড়িতে তোমার কে কে আছে--

পৃথা তৎক্ষণাৎ বলল, বড়দি, আমি একজনকে দলে পেলাম। এখনও বিদিশার কপাল ফাটেনি তা আমার পক্ষে আনন্দের কারণ।

শাশ্বতী হেসে বললেন, তুমি বিয়ে করোনি তার এক কারণ, বিদিশার নিশ্চয় অন্য কারণ। এতদিন নিশ্চয় ব্যস্ত ছিল এস-এস-সি টেসেসসি দিতে। এবার থিতু হয়ে--

ঐশী বললেন, কী আর থিতু হবে? সুন্দরবনে পোস্টিং হয়েছে, বর খুঁজে পাওয়াই দায় হবে।

শাশ্বতী বললেন, হ্যাঁ, বিদিশা, এবার শুনে নি বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

বিদিশার খাওয়ায় কিছু যতি পড়ে। আস্তে আস্তে বলে তার মায়ের কথা। তার ছোটো ভাইয়ের কথা। তার কলেজ-জীবনের কথা। তার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার কথা, কিন্তু যে-কথা বলব-বলব করেও বলতে পারে না সেই নক্ষত্রের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়, ঢোক গেলে, জল খায় বারবার।

শাশ্বতীর নজর এড়ায় না বিদিশার দ্বিধান্বিত হওয়া, আনমনা হওয়া।

পৃথার গলায় হঠাৎ জেরার সুর, কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই?

লালিমা বললেন, দাঁড়াও, প্রথম দিনেই কি বিদিশা তার বয়ফ্রেন্ডের গল্প করতে চাইবে?

শাশ্বতী চাপা দিতে চাইলেন প্রসঙ্গটা, বয়ফ্রেন্ড আছে কি নেই তা কি তোমার এক্ষুনি না জানতে চাইলে চলছে না? সেটা ওর পার্সোনাল ব্যাপার।

পৃথা থামবার পাত্রী নয়, বলল, আসলে বয়ফ্রেন্ড থাকলে তার কথা কারও না কারও কাছে বলতেই হয়। না-বললে প্রেমের অনুভূতিটা ঠিক এনজয় করা যায় না।

--ঠিক আছে, তোমার বয়ফ্রেন্ডের কথা তুমি তারিয়ে তারিয়ে বিদিশার কাছে বোলো। তা হলেই তো তুমি তোমার প্রেমটা এনজয় করতে পারবে।

ঐশীদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, এরকম ছিপছিপে শরীর রাখলে কী করে? একদম স্পোর্টসম্যানদের মতো! খেলাধুলোর অব্যেস ছিল নাকি?

লালিমাদি বললেন, হয়তো নাচটাচ করত। দেখছ না ওর আঙুলগুলো কী সুন্দর!

জোড়া জোড়া চোখ বিদিশার আঙুলের উপর ন্যস্ত হয়।

কথায় কথায় খাওয়া শেষ। সবাই বিদিশাকে এত-এত প্রশ্ন করছিল যে, বিদিশা একসময় হেসে ফেলে বলল, ও বাবা, এ যে এস এস সি পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ের চেয়েও কঠিন সব প্রশ্ন।

শাশ্বতীদি হেসে বললেন, বিভুঁয়ে থাকে তো সবাই। একজন কাউকে পেলেই হল। তোমাকে পেয়ে সবাই খুব খুশি তাই গল্পেব হাট বসিয়েছে।

গল্পে গল্পে খাওয়া শেষ একসময়। একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আবর্তিত হচ্ছিল বিদিশার শরীর ও মনে। অচেনার আনন্দ শব্দদুটো ঘুরেফিরে ঠোক দিচ্ছিল তার অনুভূতির সূক্ষ্ম অংশটিতে। একেবারে নতুন একটি পরিবেশে কয়েকজন অনাত্মীয় মানুষকী দ্রুত আপন করে নিতে চাইছে কলকাতা শহর থেকে সদ্য আসা একটি তরুণীকে।

সবাই যে যার ঘরে বিশ্রাম নিতে চেলে গেলে বিদিশা কিছুক্ষণের জন্য একা। দরজাটা ভেজিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে নিজেকে কাটাছেঁড়া করে তার নতুন জীবনের প্রস্তুতিমুহূর্তগুলিকে। সন্ধের পর আবার কিছুক্ষণ তার ঘরে অন্য টিচারদের হুজ্জুতি। রাতে একসঙ্গে বসে খাওয়া।

সবটাই রিমরিম করছে তার ভিতরমনে। দু-বছরের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হতে চাইছিল তার উনত্রিশ বছরের শরীর।

রাতে শোওয়ার সময় বিদিশা ঘরের ছিটকিনি লাগাতে গিয়ে দেখে ছিটকিনি আছে, কিন্তু উপরের আঙটাটি ঢলঢলে। ছিটকিনি গুঁজতে গেলেই বেরিয়ে আসছে অমনি। দুপুরে খেয়াল করেনি, কিন্তু রাতে ছিটকিনি ছাড়া চলবে কীভাবে! বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর বিদিশা শরণাপন্ন হয় পাশের ঘরে, ঐশীদি, ঐশীদি...

দরজা খুলে বেরোলেন ঐশীদি, বললেন, সে কী, ছিটকিনি লাগছে না?

তিনিও চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, কী মুশকিল, ছিটকিনি না দিয়ে কখনও শোওয়া যায়! বনমালীটা কিচ্ছু দেখে না আজকাল। কালই–

--কাল! বিদিশা বিপন্ন। পৃথা নামের মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে, হাতে পাড়ের টুকরো, বলল, বিদিশা, তুমি এইটে ছিটকিনিতে জড়িয়ে রাতটা কাটাও। তারপর কাল সকালে--

ঐশীদি বললেন, জায়গাটা খারাপ তো! তুমি কি রাতে আমার ঘরে শোবে?

--খারাপ নাকি জায়গাটা? বিদিশা কণ্ঠস্বরে ভয়। লঞ্চে এক অচেনা ব্যক্তির এ ধরনের কণ্ঠস্বরে হিম ধরেছিল শরীরে। আবার এখন ঐশীদি!

—ওই আর কি। থাকতে থাকতে সব জেনে যাবে।

বিদিশা ঘাড় নাড়ে, ঠিক আছে, আমি পাড় দিয়ে বেঁধে ছিটকিনি আঁটকাচ্ছি, তার পর কাল--

ঐশীদি খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, জায়গাটা তো ভালো নয়।

বিদিশা : কেন ভালো নয়, ঐশীদি? বাঘটাঘ বেরোয় নাকি?

—না, সেই বাঘ নয়। অন্য বাঘ। ঠিক আছে, তেমন বুঝলে আমাকে ডেকো।

সবাই বেরিয়ে গেলে বিদিশা ভুরুতে কোঁচ ফেলে বসে থাকে থম হয়ে। তারপর ছিটকিনিতে পাড় দিয়ে পেঁচাতে থাকে। টেবিলটা ঠেলে লাগায় দরজায় যাতে কেউ দরজা খুলতে চেষ্টা করলে উল্টে যাবে টেবিলটা, ঘুমও ভাঙবে তার।

বিদিশার মুখ দেখে বোঝা যায় সে 'অন্য বাঘ'এর কথা ভাবছে। এক বাঘের হাত থেকে রেহাই পেতে, নির্বাসনে, এখন শুনছে এখানেও অন্য বাঘ। প্রবল অস্বস্তিতে বিদিশা।

৪

স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনটা খুবই রোমাঞ্চকর মনে হওয়ার কথা, কিন্তু বিদিশা এক মুহূর্তও স্বস্তিতে নেই। হোস্টেল থেকে স্কুল মিনিট পাঁচেকের পথ, তাকে সঙ্গ দিতে পৃথা। পৃথা কাল থেকে বকবক করে স্কুল সম্পর্কে নানা জ্ঞানবর্ষণ করে চলেছে, তার কিছুটা সাদা, বেশিটাই কালো। বলেছে সুন্দরবনে বসবাস করার সুবিধে এখানে কোনও আত্মীয়-গার্জেন নেই, কিন্তু অসুবিধে এখানে বহু অনাত্মীয়-গার্জেন। অনাত্মীয়দের মধ্যে সেক্রেটারি নিমেষ মিত্রর কথাই বারবার বলছে, বিদিশা, অনেক বড়োলোক বাড়ির গেটে যেমন লেখা থাকে, 'বি ওয়ার অফ ডগ', তেমনই পাখির আলয় গার্লস স্কুলের গেটে লিখে রাখা উচিত 'বি ওয়ার অফ স্কুল-সেক্রেটারি'।

বিদিশা স্কুলের পথে যেতে দেখছিল ছোটো ছোটো মেয়েরা বিনুনি দুলিয়ে চলেছে স্কুলের দিকে। তারা কেউ কেউ পৃথাকে দেখে হাসছে, কেউ বলছে, নমস্কার দিদিমণি। কেউ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে পথ। বিদিশাকে দেখে অনেকেরই চোখে ছাপাছাপি কৌতূহল। কী ভাবছে কে জানে! তাদের স্কুলে যে একজন নতুন দিদিমণি আসার কথা তা হয়তো অনেকেই জানে না। কিন্তু পৃথা বলল, কেউ কেউ নিশ্চয় জেনে গেছে তোমার গতকাল এসে এখানে পৌঁছে হোস্টেলে ওঠার সংবাদ। ছোট্ট জায়গা বিজিতপুর। এখানে তোমার আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে কি দেরি হয়! যারা দূর থেকে আসে তারা হয়তো জানে না।

আসলে বিদিশা যে আজই আসবে তা কারও জানার কথা নয়।

গতকালই ছাত্রীবিহীন শুনসান স্কুলের চেহারাটা দেখা হয়ে গেছে তার। ছাত্রীবিহীন স্কুল আর ছাত্রীসহ স্কুলের মধ্যে একসমুদ্র ব্যবধান। আজ ছাত্রীরা দল বেঁধে ঢুকছে স্কুলে। এখনই শুনতে পাচ্ছে তাদের কলকাকলি গুঞ্জন। সাদা টপ আর মেরুন স্কার্টের সমাহার ভারি খুলেছে সবুজ পটভূমিতে। দেখল স্কুলের হইচইমুখর দৃশ্য। স্কুলের সামনের ছোট্ট মাঠটায় একটি সাদামাঠা লন। তার এখানে-ওখানে অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছপালা। কোথাও দু-একটি ফুল ফুটি-ফুটি করেও ফুটতে পারেনি।

বিদিশা পৃথার পিছু-পিছু টিচার্স রুমে ঢোকে। টিচার্স রুমের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল, তার দু পাশে পাঁচ-পাঁচ দশটা চেয়ার। একমাত্র ঐশীদি ছাড়া তখনও কেউ পৌঁছোননি। পৃথা তাকে নিয়ে যায় পাশেই হেডমিস্ট্রেসের ঘরে। শাশ্বতী মিত্র মুখ নিচু করে কী যেন লিখছিলেন। বিদিশাকে দেখে হাসলেন। বললেন, কী, রাতে ঘুম হয়েছিল তো?

স্কুলের ঘন্টা পড়তেই মেয়েরা হুড়মুড় করে ক্লাসে ঢোকে। প্রেয়ার শুরু হয়। এখানে প্রেয়ার মানে রবীন্দ্রসংগীত। ঐশীদি ভালো গান জানেন বলেই তাঁর উপর দায়িত্ব প্রতিমাসে একটি করে নতুন রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর। আজ শুরু হল 'আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও'।

বিদিশা লক্ষ করছিল প্রার্থনারত প্রতিটি বালিকা ও কিশোরীর মুখে থইথই বিস্ময় বিদিশাকে দেখে। যে কোনও নতুন টিচার এলে তাকে নিয়ে নানা কৌতূহল ছাত্রীদের মনে তাতে আর অবাক হওয়ার কী!

কৌতূহল বিদিশার মধ্যেও। সে কখনও শিক্ষিকা হয়ে সুন্দরবনের এক দ্বীপে এসে মুখোমুখি হবে এত-এত ছাত্রীর তা কি ভাবতে পেরেছিল কখনও!

প্রেয়ারের পর ক্লাস। শাশ্বতীদি বিদিশাকে নিয়ে ক্লাস সেভেনের ঘরে ঢোকেন। বিদিশার হাতে রোলকলের খাতা। ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বড়দি বললেন, শোনো মেয়েরা, ইনি হলেন তোমাদের নতুন ক্লাস টিচার বিদিশাদি।

বিদিশাদি নামটা মুহূর্তে ফিসফিসিয়ে ছড়িয়ে গেল মুখেমুখে।

শাশ্বতীদি আবার বললেন, ইনি এখন থেকে তোমাদের ক্লাসে ইংরেজি পড়াবেন। খুব ভালো টিচার।

শাশ্বতীদি চলে গেলে বিদিশার ভিতরে কিছুক্ষণ ঘোর রোমাঞ্চ ও শিহরন। কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল সামনে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা একগুচ্ছ রডোডেনড্রনের দিকে। বলল, আমি প্রথমে রোল কল করে নি। তারপর তোমাদের নাম জিজ্ঞাসা করব।

বিদিশা কাঁপা-কাঁপা গলায় রোল কল করতে শুরু করে। তার গলায় উপছে উঠছে একরাশ উল্লাসের সঙ্গে কিছু দ্বিধাও। কলেজজীবনে কখনও টিউশনি পর্যন্ত করতে হয়নি যে-মেয়ের তাকে এখন এতগুলি ছাত্রীকে পড়াতে হবে ইংরেজি।

রোলকলের পর একে একে পরিচিত হয় সবার সঙ্গে। চশমা-পরা একটি উজ্জ্বল মুখের মেয়ের দিকে চোখ পড়তে বিদিশা তাকে ডাকে, বলে, কী, তুমি ভালো করে চুল আঁচড়াওনি কেন? এদিকে এসো তো।

বড়ো বড়ো চোখের মেয়েটি আসে বিদিশার কাছে। চোখে বিস্ময়। বিষণ্ণ মুখ।

--তোমার নাম কী? টিঙ্কু? দেখি দেখি তোমার নখ? ইস্, কী বড়ো বড়ো হয়েছে। কটোনি কেন? তোমার মাকে বলবে আজই যেন নখ কেটে দেন।

পরক্ষণে বিদিশা : কই দেখি তোমাদের কী পড়া? গ্রামার? দেখি বই একটা।

বিদিশা বইয়ের পৃষ্ঠা খুলতেই টেনস্। টেনস্ তার বরাবরই প্রিয় চ্যাপ্টার। বিদিশা কিছু আড়ষ্ট গলায় পড়াতে থাকে বর্তমান কালের সীমানা পেরিয়ে প্রথমে অতীত, তার পর রওনা দেয় ভবিষ্যতের দিকে। কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল তা মনে করতে পারে না । কিছুক্ষণ পর ঘন্টা পড়ে। বিদিশা রোলকলের খাতা নিয়ে বেরোয়।

পরের ক্লাসটা অফ বলে বিদিশার নিশ্বাস নেওয়ার সামান্য ফুরসত। একটু পরেই দেখল তাকে রেখে অন্য টিচাররা এক-একে ঢুকে পড়ল যে-যার ক্লাসে। বিদিশা কিছুক্ষণ আড়ামোড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়ল স্কুলের সামনে লনটায়। নামেই লন, সবুজের চিহ্ন কমই। বনমালী নামের মালিটি ঝুঁকে পড়ে জল দিচ্ছে নতুন দোপাটির চারায়।

বিদিশা দাঁড়িয়ে যায়, এ কীরকম জল দিচ্ছেন আপনি? গাছের গোড়ায় তো লাগছেই না। এই দেখুন-

জলের ঝারিটা হাতে নিয়ে বিদিশা নিজেই জল দিতে শুরু কবে চারাগুলোর গোড়ায়। বলল, দেখুন তো, বেলিফুলের গাছগুলো কেমন মিইয়ে রয়েছে রোদ লেগে। ওই দেখুন রজনিগন্ধার ঝাড়গুলো শুকিয়ে এসেছে প্রায়।

বিদিশা বেশ কিছুক্ষণ জল দেয় লনে ঘুরে ঘুরে। বনমালী কিছুক্ষণ পরে এগিয়ে আসে, বিদিশার হাতথেকে ঝারিটা নেয়, তারপর আরও মনোযোগ দিয়ে জল দিতে থাকে।

জল দেওয়ার সময় বিদিশা লক্ষ করছিল কোনও কোনও ক্লাস থেকে ভেসে আসছে খুবই গোলমালের আওয়াজ। চশমার লেন্স প্রসারিত করে চেষ্টা করছিল সেই-সেই টিচারের মুখগুলো দেখতে। বিদিশার মনে পড়ছিল তার স্কুলজীবনের কথা। কিছু কিছু টিচার কিছুতেই বশে আনতে পারেন না ছাত্রীদের।

একটু পরেই বেজে ওঠে স্কুলের ঘন্টা। বিদিশার খেয়াল হয় তাকে শুরু করতে হবে পরের ক্লাস। চক আর ডাস্টার নিয়ে বেরোয় ক্লাসে ঢুকবে বলে। তার খুব রোমাঞ্চ হচ্ছিল একটার পর একটা ক্লাসে এভাবে পড়াতে যেতে হবে ভেবে। হয়তো নতুন টিচারি পেয়েছে বলেই তার এই আশ্চয অনুভূতি।

টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে চলেছে ক্লাস নাইনের পথে, হঠাৎ বারান্দার কোণে দেখা হয়ে যায় টিঙ্কুর সঙ্গে। টিঙ্কু ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

--কী রে, তুই কাঁদছিস? কেন রে? চোখ তো লাল করে ফেলেছিস? অগের ক্লাসে কেউ কি বকেছে, না মেরেছে?

--না, কিচ্ছু হয়নি, টিঙ্কু ঘাড় নাড়তে নাড়তে ঢুকে যায় তার ক্লাসে।

বিদিশা অবাক হয়ে টিঙ্কুর গতিপথে নজর রাখে।

ক্লাস নাইনের পরে ক্লাস সিক্স। প্রতিটি ক্লাসেই বিদিশার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে কত-কত গ্রাম থেকে পড়তে আসা মেয়েদের। তাদের পরনের পোশাক, কথাবার্তার ধরন, চোখের চাউনি থেকে বিদিশা অনুমান করে নিচ্ছে প্রতিটি পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থান। রণিতা নামের একটি কিশোরী তাকে প্রশ্ন করেছিল, দিদি, কেমন দেখছেন আমাদের সুন্দরবন?

'আমাদের সুন্দরবন' শব্দদুটি অবাক করেছিল বিদিশাকে।

টিফিনের ঘন্টা পড়তে বিদিশা চক-ডাস্টার হাতে ফিরে আসে টিচার্স রুমে। পাশেই একটা জালায় জল থাকে, তার উপরে একটি মগ। চকের গুঁড়ো লেগে হাত সাদা হয়ে থাকে প্রতিটি ক্লাসের পর। সেই গুঁড়ো ধুয়ে একটু থিতু হয় বিদিশা। অন্য টিচাররা ফেরেননি তখনও। পৃথা একা বসে। তাকে দেখে হাসল, কেমন লাগছে পড়াতে?

—ভালোই তো।

—নতুন নতুন ভালোই লাগবে। পরে দেখবে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যাচ্ছে। যা মাথা মেয়েগুলোর!

বিদিশা হাসল, সুন্দরবনে চাকরি করতে এসেছি। একটু-আধটু দুব্বো না-গজালে কলকাতার লোকে বলবে কি!

পৃথা মুখ গোমড়া করে বলল, পরে হাসি বেরিয়ে যাবে। মাথায় দুরমুশ মেরেও ভূগোল বোঝাতে পারি না। তোমার তো ইংরেজি। রেজাল্ট খুলে দ্যাখো, কেউ পেয়েছে সাত, কেউ নয়। তিরিশ ক-জন পায় জানলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

—তা হলে তো খুব খারাপ অবস্থা! আমি তো গ্রামার পড়াচ্ছিলাম। বুঝেছ কিনা জিজ্ঞাসা করতে সব এমন ঘাড় ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলছিল যেন ইংরেজিতে সব পণ্ডিত।

—কাল পড়া জিজ্ঞাসা কোরো তো! মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার।

বিদিশা হাসি-হাসি মুখে বলল, দ্যাখা যাক, আমার মাথা খারাপ হয়, না ছাত্রীদের! এমন হোমটাস্ক দিতে শুরু করব যে--

পৃথার চাউনিতে করুণা ছাড়া আপাতত আর কিছুই নেই। বিদিশা যে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে তা জানাতেই তার এই তাৎপর্যময় দৃষ্টিপাত।

বিদিশা পরক্ষণে গলা নামিয়ে জানতে চায়, পৃথা, ঐশীদি বলছিলেন এখানে অন্য বাঘ আছে। কী বাঘ?

পৃথা হাসে, এখানে থাকো। থাকতে থাকতে জেনে যাবে সব।

বিদিশা কিছু বোঝে না।

পৃথা ফিসফিস করে, মানুষ-বাঘ। সাবধানে মিশতে হবে অন্যদের সঙ্গে।

বিদিশা : মানুষ-বাঘ? সে আবার কীরকম?

--থাকতে থাকতে জেনে যাবে সব। সুন্দরবনের বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

পরক্ষণে বলল, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গলকে তবু বোঝা যায়। তার দেখা পাওয়া মানে সে দাঁত নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু মানুষ-বাঘকে তুমি চিনতে পারবে না।

৫

বিদিশা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকাদের হোস্টেলে বসে টেবিল লাইট জ্বালিয়ে চিঠি লিখছে :

কলকাতার জীবন যখন দুঃসহ হয়ে উঠল, তখন সেখান থেকে পালানো ছাড়া আর কী উপায়! সারাক্ষণই মনে হচ্ছে আমাব পিছনে তাড়া করে আসছে নক্ষত্রের ছায়া। বড়দি কালই জিজ্ঞাসা করছিলেন কেন আমি বারবার চমকে-চমকে উঠছি। বড়দিকে বা কাউকে এখনও বলে উঠতে পারিনি আমার কলকাতাজীবনের ভয়ংকর স্মৃতির কথা।

পথ চলতে গিয়েও মনে হয় পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে নক্ষত্র।

রাতে ঘুমোতে গিয়েও মনে হয় নক্ষত্র হয়তো ঘরের কোনও দুরূহ কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বলবে, ‘বিদিশা, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।’

মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠি কী এক সাংঘাতিক আতঙ্কে। মনে হয় নক্ষত্র তার লম্বা শরীরটা নিয়ে শুয়ে আছে আমার পাশে। আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ফিসফিস করে বলছে, ‘আই লাভ ইউ’।

তার ভালোবাসা যে কী ভয়ংকর, কী অক্টোপাসের মতো নির্মম, শ্বাসরোধকারী তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

বাসন্তী থেকে ভুটভুটিতে বাতাসের সঙ্গে কাটাকুটি খেলতে খেলতে কিছুক্ষণের

জলপথ পেরিয়ে বিজিতপুরের ঘাট। দখনে ঝিরঝিরে বাতাস আর রোদ্দুরের তাত একই সঙ্গে লাগবে গায়ে। একসময় মাঝি ভিড়িয়ে দেবে তীরে। শহুরে বাবুই হোন আর 'মেয়েলোক'ই হোন, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাঁশের ধরাট ধরে টালমাটাল পায়ে নামতে হবে ঘাটে। এইভাবেই জঙ্গল কেটে বসত তোয়ের করা দেশের মানুষ দিন কাটায়, তাদের সুখ-অসুখ নিয়ে তক্কো-বিতক্কো করে, গাঁয়ের সুখসুবিধের ব্যাপারে মাথা ঘামায়।

নিশ্চিন্তপুরে এসে হয়তো নিশ্চিন্ত হতেই চেয়েছি। জায়গাটা না-গ্রাম না শহর। কিছু পাকাবাড়ি আছে। নদীর ওপারে বিডিও অফিস আছে, থানা আছে, আছে আরও কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অফিস। এখানে আমাদের গার্লস স্কুল ছাড়াও আছে একটি বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। কয়েকটা প্রাইমারিও। মফসসল বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও গ্রাম্য পরিবেশ। জানি না কতটা নিশ্চিন্ত হতে পারব।

তার উপর কাল থেকে শুনছি জায়গাটা ভালো নয়। আমার বরাতটাই এমন সব সময় কিছু না কিছু ঝামেলা আমার পিছু পিছু কে তাড়া করে ফেরে।

স্কুলটা খুব একটা বড়ো নয়, কিন্তু এখানকার বাচ্চাগুলো ভারি শান্ত স্বভাবের। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে দারুণ ভালোবেসে ফেলেছে।

গার্লস স্কুল থেকে একটু দূরেই একটা হোস্টেলে আমরা ছ'জন শিক্ষিকা থাকি। সবাই কাছাকাছি বয়সের তা নয়। একেবারে কোণের ঘরে যিনি থাকেন তিনি শাশ্বতী মিত্র। যখনই হোস্টেলের ঘরে থাকেন, কী যেন লেখালিখি করেন ঘরের দরজা ভেজিয়ে। শাশ্বতীদিই প্রধান শিক্ষিকা। খুব নরম মনের মানুষ। হোস্টেলে আছেন তা প্রায় বছর পনেরো। কলকাতায় তাঁর বাড়ি, কিন্তু কালেভদ্রে যান। তাঁর স্বামী আর পুত্র থাকেন কলকাতায় তাদের পৈত্রিক বাড়িতে।

লালিমাদি আর ঐশীদি দুজনেই বিবাহিতা, লালিমাদির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। সপ্তাহান্তে বাড়ি যান, তাঁর স্বামী একটি ভ্রমণসংস্থা চালান কলকাতায়। থাকেন উত্তরপাড়ায়। লালিমাদি সময় কাটান টিভির সামনে বসে। খুব পছন্দ করেন সিনেমা দেখতে।

ঐশীদির বয়স আর একটু বেশি। তিনি কলকাতায় যান খুব কম। ঐশীদির সময় কাটে ক্যানভাসে ছবি এঁকে। ভালোই আঁকার হাত ঐশীদির। সারাক্ষণ গুনগুন করে গান করেন নিজের মনে। গানের গলাও চমৎকার।

পৃথা আর ছন্দিতা আমারই বয়সী। পৃথা নিশ্চিন্তপুরে এসেছে আমার ঠিক অগের বছর স্কুল সার্ভিস কমিশন পাশ করে। ভারি ছটফটে মেয়ে। আমার বেশ বন্ধু হয়ে উঠেছে এর মধ্যে।

ছন্দিতাও আমার বয়সী। সেও গত বছরের রিক্রুট। কিন্তু ছন্দিতা এর মধ্যেই

বেশ বিতর্কিত চরিত্র তা সবার কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠছে সারাক্ষণ। সবাই ফিসফিসিয়ে বলছে ছন্দিতাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে থাকতে।

পৃথা বা ছন্দিতা কারও বিয়ে হয়নি। পৃথা কলকাতায় তার বাড়িতে যায় সপ্তাহান্তে নানা কর্তব্য সারতে। পৃথার জীবনে অনেক সমস্যা, তবু তার প্রাণচাঞ্চল্য চোখে পড়ার মতো।

স্কুলে আরও তিনজন টিচার আছে যারা স্থানীয়, তাঁরা থাকেন দূর কোনও গ্রামে। স্কুলে ছাত্রীর সংখা খুব বেশি নয়, টেনেটুনে তিনশো।

স্কুলের চাকরিটা বেশ পছন্দ হয়ে গেছে আমার। মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে নিশ্বাস নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না.....'

ডায়েরি লেখার ফুরসতে বিদিশার ঘরে আনাগোনা চল্লিশোত্তীর্ণা রসমতীর। বিদিশার শাড়িজামা গুছিয়ে আলনায় রাখতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়, দিদি, তোমার জামাকাপড় ময়লা হয়েছে। কাচতে হবে।

--রাখো এক জায়গায়।

--আমি অন্য সবারটা কেচে দি।

—তা হলে আমারটাও কেচে দিও।

বিদিশা মুখ নিচু করে আবার তার ডায়েরিতে লিখতে শুরু করে।

বসমতী : তুমি সারাক্ষণ কী এত লেখো, দিদি?

—কী আবার লিখব! যা ইচ্ছে হয় লিখি।

—চিঠি লেখো?

—চিঠিই। তবে এই চিঠি কখন ডাকে ফেলা হবে না।

রসমতী কিছুক্ষণ তার কর্মপদ্ধতিতে জিরেন দিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করে হয়তো, কিন্তু তার ছোট্ট মগজে কুলোয় না, জিজ্ঞাসা করে, ডাকে ফেলা হবে না, তা হলে লিখে কী হবে?

হঠাৎ বাইরে কার পদশব্দ হতে রসমতী বাইরে যায়। ফিরে এসে বলে, সিক্রেটারিবাবু এয়েছেন। আপনাকে ডাকছে।

—সেক্রেটারিবাবু! আমাকে? বিদিশার কলম তার লেখার ডায়েরিতে কিছু বক্ররেখা এঁকে ফেলে তার নিজের অজান্তে। তার ভিতরের চমকে ওঠাটা ফিরে আসে কয়েক মুহূর্ত, জিজ্ঞাসা করতে চায়, কেন?

পরের মুহূর্তে মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর তো রসমতীর জানার কথা নয়। জিজ্ঞাসা করে, কোথায়?

—মিটিং ঘরে।

হোস্টেলে ঢোকার মুখে একটি ছোটো ভিজিটিং রুম আছে যাতে তিনটে

হাতলবিহীন কাঠের চেয়ার বসে থাকে সারাদিনরাত কোনও ভিজিটরের প্রতীক্ষায়, রসমতীর ভাষায় মিটিংরুম।

বিদিশা কিছুক্ষণের জন্য ব্যাকরণের কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পর মুহূর্তে ভাবল পৃথা কিংবা ঐশীদিকে বলে সেক্রেটারি আসার কথা। তারপর কী ভেবে বলে, ঠিক আছে, বসতে বলো। আমি বাইরে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাড়িটা বদলে বিদিশা বেরিয়ে গেল ভিজিটিং রুমের উদ্দেশে। স্কুল সেক্রেটারি নিমেষবাবু মাঝবয়সী। চেহারাটা ব্যবসায়ীদের মতো। মুখটা নিরেট ধরনের, কিন্তু দু-চোখে ধূর্ত চাউনি। বাইরের ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে বসে।

বিদিশা ভিজিটিংরুমে ঢুকতেই নিমেষবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাতদুটো জোড় করে বিগলিত করুণা হয়ে বললেন, বাহ্, আমাদের নতুন দিদিমণিকে তো দিব্যি দেখতে! হোস্টেল তো আলোয় আলো হয়ে গেছে আপনার আগমনে।

বিদিশা ঠিক প্রস্তুত ছিল না এরকম বিদঘুটে সম্ভাষণে। বলল, আপনি কী বলবেন বলুন।

--তেমন কিছু না। নতুন জয়েন করেছেন তাই ভাবলাম একবার দেখা করে আসি। যাকে মাইনেকড়ি দিতে হবে তার মুখটা তো দেখা দরকার।

কথায় একটা খোঁচা ছিল যা বিদিশার ঠিক মনঃপূত হল না, যেন নিমেষবাবুই বিদিশার মাইনে দেওয়ার মালিক। বলল, আর কিছু বলবেন?

--না, মানে এটা শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক আলাপ। পরে আরও ভালো করে আলাপ হবে।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে। বিদিশার গলায় কেন যেন একটু রুক্ষতা।

কিছুক্ষণ পর তিনি বিদায় নিলে বিদিশা আবার ঘরে। নিমেষ মিত্রর কথায় এমন একটা প্রভুত্ব কাজ করছিল, চোখে এমন এক ধরনের লোলুপতা যা বিদিশার ভিতরে সৃষ্টি করছিল প্রতিক্রিয়া।

রসমতীর কাজ ততক্ষণে শেষ। সে বিদায় নিতে চাইলে হঠাৎ বিদিশার নজরে পড়ে রসমতীর চিবুকের কাছে অনেকখানি কাটা, রক্ত জমে আছে।

—কী হয়েছে? কী করে কাটল?

রসমতী ঘাড় নাড়ে, ও কিছু নয়।

—কিছু নয় মানে? কতটা ডিপ করে কেটে গেছে ! কী করে কাটল বলো?

রসমতী জানায় তার মরদ মেরেছে।

বিদিশা আঁতকে উঠল, মরদ মেরেছে?

রসমতীর তাতে কোনও হেলদোল নেই, বলে, মরদ তো মারবেই, দিদি। আমাদের গাঁয়ের অনেক মরদই তো বউকে মারে।

বিদিশা কিছুক্ষণের জন্য ডুবুরি নামায় তার মনের গভীরে, কিছু কি মনে পড়ছে ফেলে আসা কলকাতার কোনও ভয়ংকর স্মৃতি! তার চিবুকেও কি কিছু কাটার দাগ রয়ে গেছে নক্ষত্র নামক অমানুষটির ভালোবাসার দৌলতে!

৬

স্কুলের অফ পিরিয়ডে কিছু না কিছু অফবিট কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে বিদিশা। অন্য শিক্ষিকারা যখন তুমুল আড্ডায় মগ্ন, বিদিশা একমনে রোলকলের ছিন্ন রেজিস্টার নিয়ে আঠা দিয়ে মেরামতি করছিল, সেসময় লালিমাদি ঢুকলেন চক-ডাস্টার হাতে। বিদিশার দিকে নজর পড়তে বললেন, কী হল, তুমি বসে বসে অকাজ করছ?

বিদিশা অবাক হয়ে বলল, অকাজ কোথায়! ক্লাসে গিয়ে রোল কল করতে আপনার অসুবিধে হয় না?

--হল তো হল। এটা তো ক্লার্ক মণিবাবুর দেখার কথা।

বিদিশা হাসল, কিন্তু মণিবাবুর তো কোনও দায় নেই। তাঁকে তো ক্লাসে গিয়ে ছেঁড়া খাতা সামলে রোল করতে হয় না। আপনাব রোল কলের খাতাটা তাও ছিঁড়ে উলিধুলি। আজ টিফিন পিরিয়ডে আপনার খাতাটাও মেরামত করে দেব।

লালিমাদি খুশি হলেন, দেবে? বাহ্, তা হলে কী ভালোই না হয়!

বিদিশা পর মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করে, কী হল, লালিমাদি, ক্লাস শেষ হয়ে গেল? ঘণ্টা তো পড়েনি এখনও?

লালিমা একটু থতমত, বললেন, দশ মিনিট আগে ছুটি করে দিলাম। পাশেব ক্লাসে এত গোলমাল হচ্ছে যে পড়ানো যাচ্ছে না।

—পাশের ক্লাস কার?

—ছন্দিতার। হঠাৎ পড়াতে পড়াতে বেরিয়ে গেল । নিশ্চয় সেক্রেটারি ডেকে পাঠিয়েছেন।

--ক্লাসের মাঝখানে ডেকে পাঠালেন?

--হ্যাঁ। সেক্রেটারির ধাবণা টিচাররা ওঁর কেনা গোলাম। উনিই সবার মাইনে দিচ্ছেন। তিনি ডাকলেই তারা আসতে বাধ্য।

—বাহ্, মাইনে তো দেয় গভর্নমেন্ট!

—সে তো আমরা বলি। কিন্তু উনি প্রায়ই কলকাতায় যান, ফিরে এসে বলেন ডি আই অফিসে গিয়েছিলাম মাইনের তদ্বির করতে। অফিসারদের না-বললে তো মাইনে আসবেই না।

--বাহ্, বেশ মজা তো!

লালিমাদি হঠাৎ সুর বদলালেন, এই বিদিশা, শুনলাম সেক্রেটারিবাবু দেখা করতে এসেছিলেন তোমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। বিদিশা মুখ না তুলেই ব্যস্ত থাকে তার কাজে।

—তোমাকে কী বলছিলেন নিমেষবাবু?

-তেমন কিছু না, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।

—কেমন লাগল ওঁকে?

বিদিশা বুঝে উঠতে পারে না হ্যাঁ বলবে, না কি না! হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হরিব্‌ল্‌।

লালিমাদি হেসে ওঠেন প্রবল ছররা ছুটিয়ে, ভালো বললে যা হোক। হরিব্‌ল্‌। দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডজেকটিভ।

—কিন্তু কথাটা সেক্রেটারির কানে পৌঁছোলে নিশ্চয় তার রি-অ্যাকশন ভালো হবে না!

লালিমাদি হেসে বললেন, ছন্দিতার সামনে কিছু উচ্চারণ না করলেই হল। তা হলে পৌঁছোবে না। আমরা ছন্দিতাকে তার আড়ালে বলি, আগুনমারির চর।

—আগুনমারি! চর শব্দটা না হয় বুঝলাম। হঠাৎ আগুনমারি কেন?

—ওই নামে একটা চর সত্যিই আছে সুন্দরবনে। সাগরদ্বীপের কাছে। সাগরদ্বীপ-- যেখানে গঙ্গাসাগর মেলা হয়। ছন্দিতা এখন আগুন নিয়ে খেলছে তো তাই আগুনমারির চর। বুঝতে পারছে না এর কী পরিণাম হতে পারে।

—কিন্তু ছন্দিতা তো কলকাতার মেয়ে!

--হ্যাঁ, কিন্তু সে কী করে যেন সুন্দরবনের মেয়ে হয়ে গেছে। নিমেষ মিত্রর সঙ্গে—

লালিমাদি থেমে যান।

—নিমেষ মিত্র ঠিক কীরকম মানুষ?

লালিমা হাসলেন, গলা নামালেন, নিমেষ মিত্র সম্পর্কে একটি স্ট্যাটিউটরি ওয়ার্নিং আছে। ওই যে বললে না, সাক্ষাৎকার সৌজন্যমূলক। বাট হিজ সাক্ষাৎকার ইজ ইনজুরিয়াস টু মোডেস্টি অফ উয়োম্যান।

বিদিশা আঁতকে ওঠে, তাই?

--হ্যাঁ, প্রথমে সৌজন্যমূলক, তারপর ক্রমে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা, তারপর অসৌজন্যমূলক হতে থাকবে আকারে-ইঙ্গিতে। ছন্দিতা সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে।

—কী করেছিল ছন্দিতার সঙ্গে?

—মেয়েদের সঙ্গে এ ধরনের লোকেরা যা করে। প্রথমে পিঠে একটু হাত। তারপর আরও একটু এগোতে চাওয়া। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাওয়া।

বিদিশা বড়ো বড়ো চোখ করে, তারপর?

—ছন্দিতা প্রথম প্রথম বলত আমাদের কাছে, কী করি বলুন তো, লালিমাদি? কী গায়েপড়া।

—তারপর?

—তারপর একদিন ছন্দিতা কেন যেন চুপ হয়ে গেল এ বিষয়ে। প্রায়ই দেখি বেরিয়ে যায় রাতবিরেতে। অনেক রাতে ফেরে। কখনও ফেরেও না রাতে।

বিদিশা স্তম্ভিত, কী বলছেন, লালিমাদি?

লালিমাদি ফিচফিচ করে হাসতে লাগলেন, কিছু একটা টোপ ফেলেছে নিমেষ মিত্র। টোপটা গিলে ফেলেছে বেচারি। এখন ওপর পক্ষে বেরোনো মুশকিল। অতএব বি ওয়্যার অফ সেক্রেটারি।

একটু পরেই ঘন্টার চিরাচরিত সেই শব্দ, ঢং ঢং ঢং ঢং—

স্কুলের ঘন্টা শুনলে বিদিশার মনে পড়ে যায় স্কুলজীবনের কথা। শব্দটার সঙ্গে কী এক অদ্ভুত ভালো লাগা। একটু পরেই টিচাররা একে একে টিচার্স রুমে। ঐশীদি ঢুকেই বললেন, বাহ্। বিদিশা একটা কাজের কাজ করছে। রোল কলের খাতাগুলোর যা অবস্থা হয়েছিল!

ততক্ষণে টিচার্স রুম ঘিরে কলকূজন। বিদিশা চোখ পাতল পাশের টেবিলের দিকে। বেলা একটা পনেরো। থার্ড পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, বিশ্রাম মানে একটু সহাস্য আড্ডা।

বাইরে এমন রোদ-চলকানো আবহাওয়া দেখে ওদিকের টেবিলে বসা ইংরেজির টিচার ঐশীদি হাসি-হাসি মুখে এদিকের টেবিলের দিকেচোখ পাতলেন, ভূগোলের শিক্ষিকা লালিমা মিত্রকে বলছেন, দেখছ, কী চমৎকার রোদ! রোদ উঠলে ক্লাসে পড়াতেও ভালো লাগে, তাই না? ক-দিন আগে যা বৃষ্টি গেল!

—যা বলেছেন! অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন একটু বেশিই রোদ্দুর। যাকে বলে সোনাঝরা দিন। আপনার তো রোদ উঠলে মন ভালো থাকে বলেন?

ঐশীদি সামান্য হাসলেন, তা থাকে। বৃষ্টি হলেই কেমন যেন মন খারাপ।

দুজনে কিছুক্ষণ আলাপচারিতা। তার মধ্যেই বিদিশা রোল কলের খাতা নিয়ে বেরিয়ে যায় ক্লাসে।

ক্লাসে ঢুকতেই মেয়েরা অমনি চুপ। বিদিশা খেয়াল করে মেয়েরা তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে ঠিক যেরকম তারাও স্কুলে পড়তে কোনও নতুন দিদিমিণি ক্লাসে এলে করত।

রোল কলের পর বিদিশা তাকায় চশমাটা নাকের উপর তুলে নিয়ে পড়ানোর উদ্যোগ নেয়।

—হ্যাঁ, তোমাদের কী পড়া আছে আজ?

ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল মণিমালা সামনের বেঞ্চি থেকে উঠে এসে বইয়ের পৃষ্ঠা মেলে ধরে।

কবিতা দেখে খুশি হয় বিদিশা। কিছুক্ষণ পড়ানোর মধ্যে হঠাৎ তার চোখ পড়ে যায় দ্বিতীয় বেঞ্চির দিকে, বলে, এই যে টিঙ্কু, তোমার মাথার চুল আজও এলোমেলো কেন?

টিঙ্কু তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার মাথার চুল ঠিক করতে চেষ্টা করে।

—দেখি দেখি, কাছে এসো তো।

টিঙ্কু মুখ নিচু করে বসে থাকে তার সিটে।

—কই, উঠে এসো।

টিঙ্কু ধীর পায়ে উঠে আসে বিদিশার কাছে।

—কী হল, আজও তুমি চুল আঁচড়াওনি কেন?

টিঙ্কু মুখ নিচু করে থাকে।

—দেখি, তুমি নখ কেটেছ কি না?

টিঙ্কু তার হাতদুটো লুকোতে চায়।

—কী হল? নখ কেটে স্কুলে আসোনি? কই দেখি?

টিঙ্কুর হাতের আঙুলে কাপড়ের ব্যান্ডেজ দেখে চমকে ওঠে বিদিশা, কী হল? ব্যান্ডেজ কেন?

পাশের মেয়েটি বলে, বিদিশাদি, ব্লেড দিয়ে নখ কাটতে গিয়ে অনেকখানি কেটে ফেলেছে।

—সে কী। তুমি নিজে কাটতে গেছ কেন? মাকে বলোনি?

পাশের মেয়েটি : ওর তো মা নেই।

বিদিশা কিছুক্ষণ স্তব্ধ।

টিঙ্কুর চোখে জল দেখ বিদিশাকে ভারী বিব্রত দেখায়।

—কী হল ? ঠিক আছে টিফিনটাইমে আমার কাছে এসো। আমি তোমার নখ কেটে দেব।

টিফিনের ঘন্টা পড়তেই অমনি একরাশ উল্লাসের সমবেত ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে স্কুলের এক-প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। শিক্ষিকারা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেই একসঙ্গে ছ-টি ক্লাসের মেয়েরা হুল্লোড় তুলে বেরিয়ে পড়ে সামনের মাঠটায়। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি, দৌড়োদৌড়ি। মেয়েরা এক-একটা দল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে স্কুলবাড়িটার নানা প্রান্তে।

বিদিশা টিচার্স রুমে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার বকেয়া কাজে। পৃথা তখন সদ্য

ফিরেছে ক্লাস থেকে, তাকে ডেকে বলল, দাও তো রোলকলের রেজিস্টারটা। যা ছিঁড়েছ এ ক-মাসে!

পৃথার জন্য অপেক্ষা না করে বিদিশা কেড়ে নেয় তার হাতের খাতাটা। টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে গামের শিশিটা বার করতেই লালিমাদি বললেন, বিদিশা, সব ক-টা রেজিস্টার মেরামত হয়ে গেলে তখন তুমি কী করবে?

বিদিশা একটুও না-ঘাবড়ে বলল, তখন অন্য কিছু করব। আলমারির উপরগুলো তো চোখে পড়ে না আপনাদের। ডাস্টবিন হয়ে আছে সব ক-টা অলমারির মাথা।

লালিমাদি কিছু বলার আগেই টিচার্স রুমে মুখ বাড়িয়েছে ছোট্ট টিঙ্কু। তাকে দেখে কী মনে পড়ে গেল বিদিশার।

—তুই এসেছিস? আয় আয়, যা নখ হয়েছে তোর হাতে!

বিদিশা তার হাতব্যাগ থেকে বার করে একটি নেল-কাটার। তারপর একটা-একটা করে বিদিশা নখ কেটে দেয় টিঙ্কুর।

টিঙ্কুর মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো মিষ্টি হাসি। নখ কাটা শেষ হতেই বলল, আসি, আন্টি?

—আন্টি বলবে না, বলবে বিদিশাদি। বুঝলে?

টিঙ্কু অপ্রস্তুতভাবে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যেতেই লালিমাদি বললেন, তুমি যদি একবার নখ কেটে দেওয়ার ট্রেন্ড তৈরি করে দাও, তা হলে দেখবে এরপর লাইন দিয়ে নখ কাটতে আসছে তোমার কাছে। তখন তোমাকে একটা বিউটি পার্লার খুলতে হবে এখানে। অনেক মেয়েই নখ কাটে না।

বিদিশা হাসি-হাসি মুখে তাকায় লালিমাদির দিকে, বলে, নখ কাটেনি বলে ওকে খুব বকাবকি করেছিলাম কাল। তাতে খুব কাঁদছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। পরে শুনলাম ওর মা নেই। তাই—

৭

সন্ধে পেরিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। টিঙ্কু বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল ক-টা শামুকখোল ডানা ঝটপটিয়ে ফিরে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। পাখিগুলোর ডানা ধূসর রঙের, তার উপর সাদা ছিটছিট। তার বাবা প্রায়ই চেনান নতুন কোনও পাখি দেখলে। বলেন, পাখির আলয়ের কাছেই যখন বাড়ি, তখন পাখিগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব না করতে পারি, চিনে রাখা তো অবশ্যকর্তব্য। সন্ধে হওয়ার একটু পরেই তার বাবা টমাস জোন্স ফিরে আসেন ঘরে। টিঙ্কুর দু-চোখ জুড়ে অমনি আলোর ঝলকানি, বাবা, জানো তো—

বাবা ঘরে ফিরলেই টিঙ্কু শুরু করে তার সারা দিনমানের কথা। তার বাবা কিছুক্ষণ শুনেই বলেন, তুমি তা হলে এবার বইখাতা নিয়ে পড়তে বোসো। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি বাথরুম থেকে।

টিঙ্কুর মুখ কিছুক্ষণের জন্য বেজার। বইয়ের র‍্যাক থেকে একে একে নামিয়ে নেয় পাঠ্যপুস্তকের রাশি। টেবিলে সাজিয়ে নেয় তার ইংরেজি বইটা। সুর করে পড়তে শুরু করে, ...

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় টেবিলের উপর বই খোলা, কিন্তু তার চোখ অন্ধকার ভেদ করে জানালার বাইরে। টমাস ঘরে ঢুকতেই--

--জানো বাবা, বিদিশা আন্টির চোখদুটো যেন দুটো বড়ো সাইজের মুক্তো।

টমাস পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গা এলিয়ে দেন বিছানার উপর। বলেন, কী পড়ছিস?

--ইংরেজি।

--ইংরেজিই তো সারাক্ষণ পড়িস। অঙ্ক করতে তো দেখিনে!

--বাবা, বিদিশাদি বলেছেন যে-সাবজেক্ট সবচেয়ে কঠিন লাগবে, সেই বইগুলোই বেশি করে পড়তে হবে।

--তা হলে পড়।

টমাস ততক্ষণে একটা ইংরেজি থ্রিলার খুলে নিবিষ্ট হচ্ছেন তার পৃষ্ঠায়।

--বাবা, একটা গল্প বলবে?

--তোর তো সারাক্ষণ গল্প!

--বলো না,বাবা?

--কীসের গল্প শুনতে চাস? বাঘের?

--তুমি তো বাঘের গল্প ছাড়া আর কিছু জানো না!

--জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এতবার বাঘের মুখোমুখি হয়েছি যে--

--তোমার ওই নর্থ বেঙ্গলের বাঘের গল্প শুনতে আর ভালো লাগে না।

--তা হলে?

--সুন্দরবনের বাঘের গল্প বলবে? তুমি তো আমাকে একদিনও সুন্দরবনের জঙ্গল দেখতে নিয়ে গেলে না!

টমাস কিছুক্ষণ ভাবেন অনমনস্ক হয়ে,তারপর বললেন, ঠিক আছে, তা হলে সুন্দরবনের বাঘের গল্পই বলি--

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে সুন্দরবন চিরকালই রহস্যে ঢেকে রেখেছে নিজেকে। সুন্দরবনের জঙ্গলে যেতে হয় নদীপথে, এর সব ক'টা জঙ্গলই এক-একটা দ্বীপ, এখানকার জঙ্গল ঘন কিন্তু গাছগুলো তেমন উঁচু নয়, জঙ্গলের চারদিকে নদী বলে

এসব জায়গা দুর্গম। তার উপর নদীতে প্রতিদিন দুবার জোয়ার-ভাটা খেলে। ফলে জোয়ারের সময় জঙ্গলের অনেক ভিতর পর্যন্ত ঢুকে যায় জল। তাতে সারাবছর কর্দমাক্ত হয়ে থাকে দ্বীপের মাটি।

কনজারভেটর সাহেবের ঘোর ইচ্ছেয় আমরা কিছুদিন আগে সুন্দরবন গিয়েছিলাম নামখানা ঘাট দিয়ে। লঞ্চে চড়ে টানা ছঘন্টা বিভিন্ন নদী ঘুরে পৌঁছোলাম কলস জঙ্গলে। পথে পার হয়ে এসেছি ভগবৎপুর কুমির প্রকল্প, লোথিয়ান জঙ্গল, ধইঞ্চি জঙ্গল আরও কত না নদী। এর আগে এক ধইঞ্চি জঙ্গল ছাড়া আর কোথাও বাঘ নেই। শুনেছিলাম কলস জঙ্গলে বাঘ আছে। তাই জঙ্গলের কাছাকাছি বিকেল নাগাদ পৌঁছোতে আমরা লঞ্চ নোঙর করি একটা খাঁড়ির কাছে। লঞ্চের সারেং একলব্য অবশ্য বলল, এত কাছে নোঙর না করাই ভালো, কারণ বাঘ ভালো সাঁতার জানে, কখন নিঃশব্দে সাঁতার কেটে আসে কে জানে।

—কিন্তু একলব্য, আমরা যে বাঘ দেখতে এসেছি, বাঘ না দেখে ঘরে ফিরব না এ যাত্রা, আর সুন্দরবনের এত ভিতরে এসে বাঘ না দেখে ফিরে যাওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়, কনজারভেটর হাসতে হাসতে বললেন।

—স্যার, তা হলে এখানেই নোঙর করি লঞ্চ। সন্ধের মুখে বাঘ নদীর ঘাটে জল খেতে আসে, খাঁড়ির কাছাকাছি থাকলেই বাঘ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা।

তবে, স্যার, বাঘের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। খুব বেশি লোকের ভাগ্যে বাঘ দেখা ঘটে ওঠেনি।

—ঠিক আছে, অপেক্ষা করা যাক, তেনাদের জন্য।

সারা সন্ধে আমরা লঞ্চের ডেকে অপেক্ষায় কাটালাম। বাঘের দেখা পাব ভেবে ঠায় বসে বসে নিষ্ফল হল প্রতীক্ষা। একটু পরে চাঁদ উঠল, জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল লঞ্চের ডেক, চারপাশের নদী, জঙ্গল। সব মিলিয়ে এমন চমৎকার দৃশ্য যে বাঘ না দেখার কষ্ট ভুলে গেলাম একটু পরেই। হঠাৎ জলে চকাস চকাস শব্দ হতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি সবাই। দেখি বাঘ নয়, একদঙ্গল সাদা ধবধবে হরিণ এসে জল খাচ্ছে জঙ্গলের কিনারে।

জঙ্গলে এমন স্বাধীন হরিণের দল দেখে আমরা চমৎকৃত। ওদের মনে বোধহয় একটুও ভয় নেই, বরং আমরাই ভয় পাচ্ছিলাম বুঝি হঠাৎ একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ঘাড়ে।

হরিণগুলো জল খেয়ে বনে ফিরে যাওয়ার পর সারা রাত আমরা ডেকের উপর বসে কাটাই। শুনলাম একই ঘাটে বাঘ আর হরিণের দেখা মেলে এই অঞ্চলে। তাই হরিণের পর হয়তো বাঘ আসবে জল খেতে। কিন্তু কোথায়কী, অনেক রাতপর্যন্ত জেগে বসেও বাঘ এল না।

টিঙ্কু রুদ্ধশ্বাস হয়ে জিজ্ঞাসা করে, হরিণদের ভয় করে না?

--এই ভয় আর রহস্যের মধ্যে বেঁচে থাকাটাই সুন্দরবনের হরিণদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ধারে নদীর কাদায় বাঘের পুরোন পায়ের ছাপ জমে আছে দেখা যায়।

কনজারভেটর সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন, কলস-জঙ্গলে বাঘ নেই, বাপু। তোমরা মিছিমিছি রাত জাগালে।

শেষপর্যন্ত ডেকের উপরই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

টিঙ্কু : তা হলে সত্যিই বাঘ নেই, বাবা?

--সারেং তো বলল, আছে। তবে দেখা পাওয়া যায় না। কখন রাতের অন্ধকারে জল খেয়ে বাঘ তার নিজের ডেরায় ফিরে গেছে আমরা তার হদিশ রাখতে পারিনি। যেমন বেঁচে আছে সুন্দরবনের হরিণ, তেমনই স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করে এ জঙ্গলের বাঘেরা। শুধু মাঝে মাঝে সুযোগ মিললেই হরিণের টুঁটি চেপে ধরে নতুন রক্তের স্বাদ ভরিয়ে নেয় তার লোল জিব।

ভোরে উঠে কনজারভেটর সাহেব বললেন, টমাস, চলো, আমরা এবার কিনারে নামি। ঘুরে ফিরে দেখি জঙ্গলটা। এখানে বেশ বালি আছে, পায়ে কাদা লাগার ভয় নেই।

আমরা সবাই মিলে জঙ্গল পরিক্রমা করি, পায়ে পায়ে অনেকটা ভিতর পর্যন্ত চলে যাই। চারপাশে কত নাম-না-জানা গাছ। ক্যাওড়া, বাইন, গেঁয়ো ছাড়াও এখানে চারদিকে বনঝাউ। বনঝাউয়ের ডালে দুটো বিশাল সাইজের মৌচাক। বোধহয় এক কিলোমিটার ঢুকে এসেছি, হঠাৎ দেখি একটা পুকুর। একজন গার্ড বলল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকেই কাটানো হয়েছিল ক-বছর আগে। নোনাজলের পরিবর্তে মিষ্টি জল খেলে তবেই না বাঘ একটু কম হিংস্র হবে তাইই।

কিন্তু তার কিনারে ওগুলো কিসের ছাপ!

কনজারভেটর সাহেবের সঙ্গে আমিও ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকি ছাপটা। দেখি, হ্যাঁ, বাঘের পায়ের ছাপই, বেশ বড়ো বড়ো। ছাপগুলো দেখে মনে হল একদম টাটকা।

ঠিক সেসময় হঠাৎ একটু দূরে বিশাল হুঙ্কার। আমাদের হৃদপিন্ড বোধহয় একমুহূর্তের জন্য থমকে গেল সেই হুঙ্কার শুনে। পরমুহূর্তেই বুঝতে পেরে যাই সামনে সমূহ বিপদ। আর তক্ষুনি আমরা ছুটতে থাকি একশো মিটার দৌড়ে যেমন ছোটে স্প্রিন্টাররা। একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে নদীর ধারে।

টিঙ্কু কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে বলল, দেখে পেলে না বাঘের?

--পেলে কি আর বেঁচে ফিরতে পারতাম সেদিন?

—কেন, তোমাদের গার্ডদের কাছে রাইফেল থাকে না?

—থাকে বইকি! তবু সাবধানের মার নেই। যদি গার্ডদের টিপ ফসকায়?

টিঙ্কুর পছন্দ হল না তার বাবার যুক্তি, বলল, তা হলে আর গার্ড কীসের? তুমি আমাকে জিম করবেটের বই পড়তে দিয়েছিলে, তাতে করবেটের টিপ ফসকাত না কিন্তু!

টমাস দীর্ঘশ্বাসের হাওয়া উড়িয়ে বললেন, সেই জন্যই তো তিনি জিম করবেট। আর এরা গার্ডমাত্র।

টিঙ্কু প্রসঙ্গ বদলে বলল, জানো বাবা, বিদিশা আন্টির চোখদুটো কী দারুণ! যেন দুটো বড়ো সাইজের মুক্তো।

টমাস কিছুক্ষণ সময় নিলেন প্রসঙ্গান্তরে ফিরতে, বললেন, তাই নাকি? তুই তো কদিন থেকে শুধু বিদিশা আন্টির কথা বলছিস?

একটু দূরে খাটের উপর আড় হয়ে শুয়ে বছর চল্লিশের টমাস এতক্ষণে নিবিষ্ট হতে চাইছেন ইংরেজি থ্রিলারের পৃষ্ঠায়।

—চোখদুটোর ঠিক মাঝখানে দুটো কালো বৃত্ত। সে দুটো আসলে চোখের মণি। সেই মুক্তো দুটোর দিকে তাকালেই মন ভরে ওঠে আমার।

—তাই নাকি?

—তুমি আমার কথা শুনছ না! সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকলে আমার কথা শুনবে কখন?

—তুই তো পড়ছিস এখন। আগে পড়াটা শেষ করে নে। তারপর তোর বর্ণনা শুনব মন দিয়ে।

—জানো, আমাকে কী যত্ন করে নখ কেটে দিয়েছেন আজ।

—তা হলে তোকে খুব ভালোবাসেন আন্টি, তাই না?

—আন্টি বললে খুব রেগে যান। বলেন দিদি বলবি। বিদিশাদি।

—তা হলে তাই বলিস।

—কিন্তু আমার আন্টি বলতে খুব ভালে লাগে।

—জানো বাবা, এখন সকাল হলেই আমার মনে হয় কখন স্কুলে যাওয়ার সময় হবে। বাসে উঠে কিছুক্ষণ কলকাতা দেখার ফুরসতে অমনি স্কুল পৌঁছে যাই। স্কুলের পাঁচিল পেরোলেই অমনি বিদিশা আন্টি।

টিঙ্কুর বাবা বই বন্ধ করে টিঙ্কুর দিকে চোখ রাখেন, যাক বাঁচা গেল। এতদিন পরে তবু একজন আন্টিকে তোর পছন্দ হল। এর আগে যত স্কুলে পড়েছিস, কোথাও তোর পছন্দ হত না আন্টিদের।

পড়ার টেবিলে বসে বারবার টিঙ্কুর চোখ চলে যায় জানালার বাইরে। সেই নীল

আকাশে যখন একটা কি দুটো চিল বৃত্তাকারে ওড়ে, টিঙ্কুর মনে হয় বিদিশা আন্টির চোখের মণি ঘুরছে টিঙ্কুকে কেন্দ্র করে।

--জানো বাবা, বিদিশা আন্টি না খুব গাছ ভালোবসে। ঠিক তোমার মতো।

টমাস মুখ তোলেন, তাই নাকি?

--হ্যাঁ। সেদিন আমাদের মালিকে যা বকছিলেন না! বলছিলেন রোজ জল না দিলে গাছগুলো বাঁচবে কী করে? তোমাকে যদি দুদিন না-খাইয়ে রেখে দেওয়া হয়, তুমি কথা বলতে পারবে? চিঁ চিঁ করবে তো।

বলতে বলতে টিঙ্কু হেসে কুটপাট।

৮

বিজিতপুরে সকাল আসে সমুদ্রের হাওয়ায় ভর করে। হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই সকাল কিছুক্ষণ অনুভব করে বিদিশা। তারপর ঘরে এসে আড় হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয় ডায়েরির পৃষ্ঠায়। রসমতী প্রথমেই বিদিশার ঘরে আসে কাজ করতে যেহেতু এত সকালে আর কেউই ওঠে না ঘুম ভেঙে।

--চা করে দেব, দিদিমণি?

--না, বলে বিদিশা ডায়েরি লেখায় মন দেয় :

'দেখতে দেখতে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল নিশ্চিন্তপুরে বসবাস। কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছি বুঝতে পারছি না। গতকাল ফোন করেছিল বুম্বা। বলছিল নক্ষত্রকে এখনও জামিন দেয়নি। হয়তো দেবেও না। বিদিশাদের উকিল প্রার্থনা জানিয়েছে নক্ষত্রকে জামিন দিলে তাদেব বিপদ অনিবার্য।

নক্ষত্রের কথা ভুলে চেষ্টা করছি নিশ্চিন্তপুরের জীবনযাপনে অবগাহন করে ভুলে যেতে সেই পুরোনো পৃথিবী।

কিন্তু ভুলতে চাইলেও কি সবটা ভোলা যায়!

সেদিন পৃথার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম গ্রামটির নিরীহ চেহারা আবিষ্কার করতে। বিজিতপুরে প্রথমে ঢুকতেই যেটি চোখে পড়বে, তা হল বিজিতপুর হাইস্কুল। বেশ বড়োসড়ো বিল্ডিং , আশেপাশের দূর-দূর গ্রাম থেকে ছাত্ররা কেউ হেঁটে, কেউ নদী পেরিয়ে আসে এখানে পড়তে।

ইস্কুলের ছাত্রদের একটা বড়ো অংশই তপসিলি জাতির, আর সেই সুবাদেই এই ইস্কুল এবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির অনুমোদন লাভ করেছে সরকার থেকে।

কাছেই আছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কিছুটা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। পুরো কেন্দ্র নয়, উপকেন্দ্র।

পানীয় জলের জন্য মাঝেমধ্যে নলকূপ। জুনিয়ার হাইস্কুল, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এইসব।

এ ছাড়া একটি লাইব্রেরি 'চপলারানি স্মৃতি পাঠাগার'। লাইব্রেরি দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছিলাম সদস্য-সংখ্যা কত, দৈনন্দিন পাঠকের সংখ্যাই বা কত। খুব উৎসাহব্যঞ্জক অবশ্য নয়। তবু একটা লাইব্রেরি আছে এটাই ঢের। ক্লাবের ছেলেরা বলছিল তাদের ফুটবল টিম খুব জোরদার। অনেক ট্রফি নিয়ে এসেছে টুর্নামেন্ট খেলে।

ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলাম জানাদের দেবোত্তর সম্পত্তির কাছে। এখানে গড়া হয়েছে মন্দির, প্রতিবছর দুর্গাপুজো হয় এই দালানে। পাশে খেলার মাঠ, বিশাল শান-বাঁধানো পুকুর, যার পাড়ের চারপাশে কলাবাগান। নতুন নারকেল চারাও পোতা হয়েছে চারপাশে। এরই এক কোণে গড়ে উঠেছে নতুন ক্লাবঘর সবুজ সংসদ, গাঁয়ের যুবকদের একমাত্র আলাপ-আলোচনা, চর্চা, মেলামেশার জায়গা।

ক্লাবঘরের কাছে জমায়েত হয়েছিলেন গাঁয়ের যুবকরা সুনীত দাস, নিখিল জানা, বুদ্ধিশ্বর মাইতি আর ক্লাবের সম্পাদক অসিত জানা। গাঁয়েই যেখানেই ঘুরেছি অবাক হয়ে লক্ষ করেছি সবুজ সংসদের অফুরান উৎসাহের ভাণ্ডার। এইসব যুবকদের হাতের অদৃশ্য ছোঁয়ায় গড়ে উঠছে গ্রামের সংস্কৃতি। তাঁরা সবাই একজোট হয়ে শলাপরামর্শ করে গাঁয়ের কিসে দুটো ভালো হবে তার কথা ভাবেন। ওঁদের ক্লাবের বাঁধানো খাতায় বিভিন্ন সরকারি অফিসারদের মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে ক্লাবের কার্যকলাপ সম্পর্কে। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে খোদ রাজভবন থেকে শুরু করে সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের সার্টিফিকেট, ফাইলেও জমা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পাঠানো চিঠিপত্র।

গ্রামের আরেকটু ভিতরে ঢুকলেই আসল চেহারাটা চোখে পড়ে। সুন্দরবনের মাটি লোনা বলে বাব্‌লা, বাজবরণ, গেঁয়ো, খেজুর, তাল এরকম কয়েকশ্রেণির গাছ ছাড়া বড়ো গাছের ছায়া মেলে না কোথাও। বসতবাটিগুলিও বেশ দূরে দূরে। দেখে ধারণা হয়, পত্তন গড়ার সময় যে-যার নিজের জমির মাঝখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন যাতে সম্পত্তি বক্ষা করতে সুবিধে হয়। সেই এক ঘর থেকে এখন ভাগাভাগি হয়ে তিন / চার ঘর, ব্যস্ তার বেশি নয়। পরের বাড়ি খুঁজতে হলে অন্তত দু-তিনটে আল পেরোতে হবে। তবু এর মধ্যে বিজিতপুরে বসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। আমনের মরসুমের পর সবারই বাড়ি কিছু কিছু ধান ওঠে, তাতে কারও সংবৎসরের খোরাকির চাল হয়, কারও কম পড়ে দু এক মাসের। যাদের তাও হয় না, তারা লোকের বাড়ি মজুর খাটে, ধান রুয়ে, ঝাড়াই মাড়াই করে, ভেনে আরও দু-এক বস্তা ধান ঘরে তোলে।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম নদীর পাড়ে। আশ্চর্য এখানকার নদীর সৌন্দর্য।

নদীর ঘাটে একজন বুড়ো মতো লোক নৌকোর ফুটো মেরামত করছিলেন মুখ নিচু করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলাম নানা কথা। মানুষটার নাম কৃষ্ণকান্ত বেরা। তিনি বেশ মজার মানুষ। বলছিলেন, ফর্সা মেয়েমানুষ কলকেতা থিকে এখানে আসে আর নোনাজলের হাওয়ায় রং পুড়ে অমনি কালচে। আপনে নতুন কিনা তাই বুঝতি পারছেন না। ক-মাস গেলিই দ্যাখবেন--

পৃথা হাসছিল আমার মুখের অবস্থা লক্ষ করে। ফর্সা রঙের হ্যাংলামি আমার নেই। জীবনে ঠিকঠাক বাঁচতে পারলেই এখন বর্তে যাই।

কৃষ্ণকান্ত বেরার মুখেই শুনছিলাম এসব জনপদের নানা বৃত্তান্ত।

সুন্দরবন বলতে যে চিত্র ফুটে উঠেছিল কলকাতায় থাকতে নিশ্চিন্তপুরে এসে ঠিক তেমনটি মনে হচ্ছে না। এখান থেকে দুটো দ্বীপ পেরোলেই গভীর জঙ্গল, কিন্তু মাঝে অনেকখানি চওড়া নদী থাকায় চট করে বুনোজন্তুর প্রাদুর্ভাব ঘটেবে তা নয়। পাশের দ্বীপে যারা বসবাস করে তাদের এলাকায় কোনও এককালে বাঘ এসেছিল শোনা যায়, কিন্তু সেই বাঘ ধরা পড়েছিল বাসিন্দাদের হাতে। তারপর বহুকাল আর তেনাদের উপদ্রব ঘটেনি।

কৃষ্ণকান্ত বেরার মুখে একটু একটু করে শুনছিলাম নিশ্চিন্তপুরও কোনও এককালে সুন্দরবন ছিল, বসবাস করত বুনোজন্তুরা। কলকাতার বাবুরা, চব্বিশ পরগনার জমিদাররাও সুন্দরবনের জঙ্গলের বন্দোবস্ত নিয়েছিল ইংরেজ সাহেবদের কাছ থেকে। ইংরেজ রাজারা তৎকালীন বাবু আর জমিদারদের ডেকে এক-এক লপ্তে পাঁচ-সাত হাজার বিঘে জমি ইজারা দিয়ে দিয়েছিলেন নামমাত্র দামে। তারপর শুরু হয়েছিল জঙ্গল কাটাই। এক-এক লপ্তে হাজার-হাজার বিঘে জমি হাসিল করে বসত সৃষ্টি করবে এমন মনস্থ করে জমিদাররা আদিবাসীদের নিয়ে এল ছোটোনাগপুর এলাকা থেকে। সেই থেকে আদিবাসীরা আজও এই বিশাল সুন্দরবনের জনতাদের একাংশ। তাদের সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত বেরার পূর্বপুরুষদের মতো বহু ঘর-ফেলে-আসা লোক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শুরু করে জঙ্গল কাটাইয়ের কাজ। তৈরি করে ফেলেছিল ছোট ছোট বসতি। কেউ-কেউ জঙ্গল কাটার সময় বাঘের পেটে চলে গেল, কেউ প্রাণ খোয়াল সুন্দরবনের বিষাক্ত সাপের কামড়ে। অনেকেই না-খেয়ে, হাবিজাবি খেয়ে বেঘোরে জঙ্গলের মধ্যে মরে গেল।

জঙ্গল কেটে জমিন হাসিল করে রাশি রাশি সাপ আর বাঘের সঙ্গে কোঁদল করে পাওয়া এইসব জমিজিরেত এখনও একফসলি। বাসিন্দে মানুষ তাদের বাপ ঠাকুর্দার কাছ থেকে পেয়েছেন এই জমিন। এখন কারও দশ বা পনেরো বিঘে। অথচ এককালে কেউ পাঁচশো কেউ হাজার দু-হাজার বিঘে পর্যন্ত জমিনের মালিক ছিল। আসলে সেই জমিন ভাগ হতে হতে অনেকে আবার দেউলের কোঠায়।

সেই জঙ্গল কেটে গড়ে উঠেছে বসত তাও দেড়শো বছরেরও বেশি। সরকারের খাতায়-কলমে এই লোকালয়গুলিও সুন্দরবন নামে খ্যাত। সরকার থেকে সুন্দরবনের নামে আলাদা করে উন্নয়নের টাকা বরাদ্দ হয়।

এলাকার মানুষ চাষনির্ভর। কিন্তু দ্বীপের চারপাশের নদীর নোনাজল একবার বাঁধ টপকে জমিনে ঢুকলে নোনাজলের বিষে ধানের রফাদফা। নোনাজলের হাত থেকে জমিজিরেত রক্ষে করবার জন্য ধন্না দিতে হয় সরকারি ইরিগেশন বিভাগের কাছে। বলতে গেলে একদিকে তাঁদের দক্ষতা, নজর ও অর্থসংস্থানের ওপর নির্ভর করে থাকে এই সুন্দরবনের মানুষ।

বাঁধে মাটি পড়ল তো ধান টিকে যাবে সে বছর। নইলে কোটালের জলে ও ঝড়েব দাপটে পড়ে বাঁধ ফর্সা, সঙ্গে সঙ্গে একফসলি আমনধানও।

'বাবু, বাঘ সাপের সঙ্গে কোঁদল করার কল্‌জে আমাদের ছিল, কিন্তু সমুদ্দুরের হাঁ এর কাছে আমাদের কোনও মেহনতই টেঁকে না। রক্ত জল করা ফসলের বুক পুড়ে হেজে গন্ধ ছড়াতি লাগে যেন। বছরভর কেবল হা-হা মাঠ, বালবাচ্চার খিদে আর রোজ বর্ষায় হাঘরে হয়ে চোখের জল ফেলি।

এই যে সব জমি জিরেত দেখছেন, এখানেই এককালে সুন্দরবনের জঙ্গল ছিল। সুন্দরী, কেওড়া, গেঁয়ো বা পশুর গাছের ঘনঝোপ আর বাঘ-হরিণের আস্তানা হিসেবে জানা ছিল আমার বাপ্‌-ঠাকুর্দার। তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকা কৃষ্ণকান্ত বেরা কাঠের ভিতর পেরেক গিঁথতে গিঁথতে বললেন বিদিশাদের। এখন জমির চারদিকে ইরিগেশনের বাঁধ, নোনাজল ঠেকাচ্ছে, তাতেই না চাষ হচ্ছে আমনধানের। এখন দেখলে বিশ্বাসই হবে না এখানে এককালে মানুষের বসতি ছিল না।'

একমনে ডায়েরি লিখতে লিখতে বেলা বেড়ে যায়। রসমতী এতক্ষণ রান্নাঘরে গিয়ে টুকটাক কাজ করছিল, হঠাৎ ফিরে এল বিদিশার ঘরে।

—এবার চা করি, দিদিমণি?

—পাশের ঘরের সবাই উঠেছে?

—হ্যাঁ। লালিমা দিদিমণি ডাকছে। গেলেই কী বলবে জানো?

—কী?

—বলবে তুমি তো সারাক্ষণ বিদিশা দিদিমণির ঘরেই থাকো। তাঁর ফ্যাক খাটো।

—তাই নাকি? তা হলে আর বেশি আমার ঘরে থেকো না।

রসমতীর গলায় উষ্মা, আমি কার ঘরে বেশি থাকব তা কি তেনার হুকুমমতো থাকব?

বিদিশা চোখ তোলে, কী, তোমার মরদ কাল রাতে মেরেছিল?

রসমতী : না দিদি।

—আমার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল পথে। আমি খুব করে ধমকে দিয়েছি তাকে। বলেছি, ফের যদি তুমি মারো—

রসমতী গালে হাত দেয়, হেই দিদি, ও তো খুব রেগে যাবে আমার উপর!

—কেন রাগবে? আমার সামনে দুই হাতে কান ধরে বলল, আর কুনোদিন মারব না উকে।

—দিদি, যখন উ ভালো থাকে, তখন উয়োর মতো ভালো লোক আর নেই। কিন্তু যেই না পেটে উটি পড়বে, অমনি বুনো মহিষ।

—ঠিক আছে, এরপর যেদিন মারবে, আমাকে বোলো। এইসান ধমকাব না!

পাশের ঘরে অন্যরা ততক্ষণে উঠে ডাকাডাকি করছে রসমতীকে, রসমতী, চা দিয়ে যাও।

বিদিশা হেসে বলল, ঠিক আছে, এবার তুমি চা করে আনো। ক-টা বাজল বলো তো? ও বাবা, এ তো বেলা দুপুর! সাড়ে সাতটা!

৯

বিদিশা হোস্টেলে ফিরছে বিকেল পেরিয়ে।

তার ভিতরে একটু চা-চাই চা-চাই ইচ্ছে। রসমতীকে দেখে বলল, চা হবে রসমতী?

রসমতী আজ ঠিক একা নয়, তার সঙ্গে বছর একুশ-বাইশের একটি মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে কি না তা বুঝে উঠতে পারল না বিদিশা। কিন্তু তার কাছে ঘুরঘুর করছে একটি চার বছরের বাচ্চা।

—মেয়েটা কে, রসমতী?

রসমতী মুখ নিচু করে, তোমাকে না বলেছি আমার একটা মেয়ে আছে।

—হাঁ হ্যাঁ। এই তোমার মেয়ে নাকি?

—হাঁ। দুলি। আর এই আমার নাতি। ওর নাম বিল্লু।

বিদিশা দুলির শরীরে এয়োতির চিহ্ন খোঁজে। জিজ্ঞাসা করে, তা ওর স্বামী কী করে?

রসমতী গলা খাদে নামায়, ওর বিয়েই হয়নি তো স্বামী কোথায় পাবে।

—বিয়ে হয়নি? তা হলে নাতি কোথা থেকে এল।

বিদিশা স্তম্ভিত হয়ে শোনে তার মেয়ে কীভাবে শিকার হয়েছিল বিজিতপুরের কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির। কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম বলতে পারবে না। কিন্তু এখন বিল্লু বড়ো হয়েছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করতে চায়, কিন্তু ভর্তি করতে পারছে না। মাস্টারমশাই বিল্লুর বাবার নাম না লিখলে ভর্তিতে নেবেন না।

বিদিশার ভিতরে কোথাও একটা চোরাস্রোত বয়ে যায় তার আত্মজীবনীর

কোনও পৃষ্ঠায় কলমের খোঁচা লাগল বলে। তার ও তার ভাইয়ের স্কুলে ভর্তির সময়েও এরকম প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে বারবার। তার মা নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন মায়ের পরিচয়েই ভর্তি হবে তাঁর ছেলে-মেয়ে।

--কিন্তু , বিদিশা থমকে যায় পরবর্তী প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে। দুলির সন্তান অবৈধ। সেই সন্তানকে কেন পৃথিবীর আলো দেখতে দিল দুলি!

রসমতীর মেয়ে দুলি রাইসমিলে কামিনের কাজ করে। সেখানেই গর্ভবতী হয়েছিল তার মেয়ে দুলি। দুলি কিছুতেই অ্যাবরশন করতে রাজি হয়নি।

বিদিশা কিছুক্ষণ লক্ষ করে মা-মেয়ের অভিব্যক্তি, তারপর ফিরে যায় সেই অবধারিত প্রশ্নে, কিন্তু ওর বাবা কে তা কেন বলছ না ?

মা-মেয়ে দুজনেই চুপ করে থাকে। বিল্লু খেলা করছে আপন মনে।

—বলো, ওর বাবা কে?

পৃথা ঠিক তখনই এসে পৌঁছেছে হোস্টেলে। এগিয়ে এসে বলল, কে ওর বাবা তা বলতে পারলেই তো দুয়ে-দুয়ে চার হয়ে যেতে পারত, বিদিশা। ওর ছেলেও ভর্তি হতে পারত স্কুলে।

—তার মানে?

পৃথা : এখানে অনেক কিছুর মানে খুঁজতে যেয়ো না। বিপদে পড়ে যাবে। দুলিও যেমন কোনও দিন বলতে পারবে না ওর ছেলের বাবা কে? বললে হয়তো যে কোনও দিন খুন হয়ে যেতে পারে ও।

বিদিশা স্তম্ভিত।

১০

আজ স্কুলের পাঁচিল পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই টিঙ্কুর চোখে পড়ে চশমা-পরা আন্টি অনেকটা ঝুঁকে পড়ে দেখছেন একটা ঝাঁকড়া রঙ্গনগাছকে। ছাতার মতো ছড়িয়ে থাকা গাছটার রাশি রাশি পাতাগুলোয় ছুঁয়ে আছে ঘন চুলে ভরা আন্টির মাথাটা । আন্টির ডান হাতে একটা নারকেলের লম্বা দড়ি। বাঁ হাতে ঝাঁকড়া রঙ্গনগাছটার গোড়া। নারকেলের দড়ি জড়িয়ে বাঁধার চেষ্টা করছেন রঙ্গনগাছটাকে।

কয়েকদিন আগেই বিদিশা আন্টি বলছিলেন এবার ফুল ধরবে রঙ্গনগাছটায়। টিঙ্কুরও মনে হচ্ছিল এবার তা থৈ তা থৈ নেচে উঠবে লাল কুঁড়ি ধরে আসা অত বড় গাছটা। কিন্তু আজ বিদিশা আন্টির শরীর ঝুঁকিয়ে রঙ্গনগাছটা সাপটে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধার দৃশ্যটা কেমন উৎকণ্ঠিত করল টিঙ্কুকে। তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে হঠাৎ । ছুটে গিয়ে বলল, আন্টি, দাঁড়ান, আমি আপনাকে হেল্প করি। আপনি একা কি সামলাতে পারেন এত বড়ো গাছটাকে!

বিদিশা : এই তুই আমাকে আন্টি বলিস কেন রে? সবাই তো দিদি বলে। বিদিশাদি।

টিঙ্কু হেসে বলে, আগে একটা স্কুলে পড়তাম, সেটা ইংলিশ মিডিয়াম। সেখান থেকেই আন্টি বলা আমার অব্যেস, এখন আর দিদি ডাকতেই পারি না, কী করব, আন্টি?

বিদিশা হেসে ফেলে, নে ধর তো এই জায়গাটা—

বিদিশা আন্টি তাদের ইংরেজির টিচার। তাঁকে টিচার হিসেবে পেয়ে জীবনটা একেবারে বদলে গেছে টিঙ্কুর। বিদিশা আন্টিকে দেখতে যেমন চমৎকার, চোখদুটো যেমন মায়াময়, তেমনি তাঁর সুন্দর ব্যবহার। আজও কী দারুণ একটা ম্যাজেন্টা রঙের শাড়ি পরে আছেন বিদিশা আন্টি। এই শাড়িটা পরলেই কেমন মা-মা দেখায় বিদিশা আন্টিকে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা পরেন বলে বলে আরও ঝকঝকে দেখাচ্ছে তাঁর ডিমের আকারের মুখখানা।

টিঙ্কু একছুট্টে তাঁর কাছে গিয়ে গাছের গোড়াটা ধরতেই বিদিশা আন্টি অমনি সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠলেন, যাক, বাঁচালি! তোর জন্যেই তো এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। আরও কত মেয়ে তো যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কেউ তাকাচ্ছেই না পাছে আমি তাদের সাহায্য করার জন্য ডাকি। আর তুই না ডাকতেই কেমন পাশে এসে দাঁড়ালি!

টিঙ্কু অমনি লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়। বিদিশা আন্টি এমন সব কথা বলেন না! বিদিশা আন্টির কথার ধরনই এমন। কখনও তাকে দেখলেই বলে উঠবেন 'বুঝলি, এতক্ষণ তোর কথাই ভাবছিলাম!' কিংবা এরকম মন জুড়োনো সব কথা। যেন তিনি সারাক্ষণই টিঙ্কুর কথা ভাবেন। তাই কখনও হয় নাকি!

বিদিশা আন্টির সারাদিন তো ব্যস্ত থাকেন স্কুলের হাজারো কাজ নিয়ে। সত্যিই কি তিনি টিঙ্কুর কথা ভাবার সময় পান! হবেও বা।

অবশ্য বিদিশা আন্টি তাকে এতটাই ভালোবাসেন যে, টিঙ্কুর মনে হয় তিনি হয়তো সত্যিই তার কথা ভাবছিলেন। এখন টিঙ্কুকে দেখে বললেন, কটা বাজে বল তো? ক্লাস আরম্ভ হতে আরও কিছুক্ষণ দেরি আছে। কাছে আয়। রঙ্গন গাছটা কীরকম ছড়িয়ে পড়েছে দ্যাখ! ভালো করে বেঁধে দি।

বিদিশা আন্টি তাঁদের টিচার্স হোস্টেলে থাকেন। মাত্র কয়েকদিন স্কুলে এসেই এখন স্কুলটাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সারাদিন স্কুলে ক্লাস নেওয়ার পর অবসর সময়ে বাগান তৈরি করে সময় কাটে তাঁর। স্কুলের সামনে ছোট্ট একটা লন ছিল, খুব অযত্নে ছিল লনটা। তার চারপাশে কত কত পাতাবাহার আর ফুল গাছ পুঁতেছেন। যখন ফুলগুলো একে-একে ফুটতে থাকবে স্কুলবাড়িটাকে কী যে চমৎকার দেখাবে। আর এত সব পরিকল্পনার সবটাই বিদিশা আন্টিরই।

টিঙ্কু বলে, 'আর একটা মালি রাখুন না, আন্টি!' কিন্তু আন্টি বলেন, 'ধুর, ওরা এত ফাঁকিবাজ যে ওদেব পিছনে বকতে বকতে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।' স্কুলের যিনি মালি হিসেবে কাজ করেন তার ফাঁকিবাজি ঠিক ধরা পড়ে গেল বিদিশা আন্টির চোখে। বিদিশা আন্টি তাকে ডেকে বললেন, কী ব্যাপার, বনমালী, আপনাকে যদি একদিন খেতে না দেওয়া হয়, কীরকম লাগবে বলুন তো? জিনিয়া আর ডালিয়া গাছগুলোর গোড়ায় কতদিন খাবার দেননি! দেখেছেন, কীরকম আমসি মেরে গেছে এমন নধর পাতাগুলো! ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ! এরকম ফাঁকি দিলে গাছগুলো বাঁচবে?

গাছগুলোর একটু অযত্ন হলেই চোখে পড়ে যায় তাঁর।

টিঙ্কুকে পেয়ে বর্তে গেলেন বিদিশা আন্টি । শিগগির এদিকে আয়। ধর দেখি দড়ির গোড়াটা। বেঁধে দিলে কী সুন্দর দেখাবে ফুল ফুটলে!

দুজনে বেশ জুতজাত করে বেঁধে ফেলা গেল গাছটা।

আন্টি তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ভাগ্যিশ তুই এসেছিলি সময়মতো!

তাঁর হাসি দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায় টিঙ্কুর। শরীরে একরাশ ভালো-লাগা নিয়ে চলে এল নাচের ক্লাসঘরে। ঘড়িতে তখন ঠিক এগারোটা বাজতে দুই।

তাদের পাশ দিয়ে গল্প করতে করতে গেলেন তাদের দুই টিচার, লালিমাদি আর ঐশীদি।

যেতে যেতে বিদিশাকে গাছ বাঁধতে দেখে লালিমাদি বললেন, তুমি পারোও বটে, বিদিশা।

বিদিশা হাসল শুধু।

ঐশীদি বললেন, শিগগির এসো, বিদিশা। ঘন্টা পড়ল বলে।

তারা চলে যেতে বিদিশা বলল, তুই দেখলি, টিঙ্কু? সাহায্য তো করেই না, উল্টে—

একটু পরেই স্কুলের ঘন্টা বাজে। অমনি বিদিশা টিঙ্কুকে নিয়ে রওনা দেয় ক্লাসরুমের দিকে। প্রেয়ারের গান শোনা যায় একটু পরে।

১১

বেশ তেড়েফুঁড়ে রোদ্দুর উঠেছে তবু রোদের বল্লম উপেক্ষা করে বিদিশা একদিন টিফিনের পর বেরিয়ে পড়ল স্কুল থেকে। শাশ্বতীদিকে বলল, টিফিনের পরের পিরিয়ডটা আজ অফ আছে আমার। ঘন্টাখানেক সময় আমার ফুরসত আছে। আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

শাশ্বতীদি বড়ো বড়ো চোখ তুলে বললেন, দূরে কোথাও নয় তো?

--না। এই তো সামনেই। বিজিতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

--প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! কেন, চেনা কেউ আছে নাকি?

--না। একজনের ভর্তির তদ্বির করতে।

শাশ্বতীদি আরও অবাক, কার ভর্তির?

--আমি এসে সব বলছি।

বিদিশা এখনই আর কথা বাড়াতে চাইল না। ইঁট-বাঁধানো রাস্তা বরাবর পা বাড়ায় বিজিতপুর অভিমুখে। মিনিট পনেরো পথ, এখান যাতায়াতের জন্য ভানরিকশ পাওয়া যায়, কিন্তু ভ্যানবিকশর পিছনে পা ঝুলিয়ে বসতে ভারি লজ্জা লাগে তার। তার চেয়ে জোরে হেঁটে গেলে পৌঁছে যাবে দশ মিনিটে। তার এই দ্রুতপদক্ষেপ দেখে পথচারী কেউ কেউ অবাক চোখে তাকায়। অনেকেই তাবে চেনে না।

বিজিতপুর বাজারের একেবারে শেষপ্রান্তে ছোট্ট চালাঘর। তার টালির চালের উপরে লেখা প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নাম। বিদ্যালয়টির টিফিন হওয়ায় প্রাঙ্গণে কচিকাঁচাদের কাংস্য-চিৎকার। সেই হুল্লোড়ের মধ্যে বিদিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ঘরে গিয়ে দেখল তিনি তখন মুড়ি খাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন গোল-গোল মুখ করে। কোনও পরিচয় না-দিয়েই শুরু করল, মাস্টারমশাই, দুলির ছেলেকে কেন ভর্তি করছেন না?

দুলি শব্দের ঠোক্কর খেয়ে প্রধান শিক্ষক ভীষ্মদেব দাসের অভিব্যক্তিতে হকচকানি।

--কে দুলি?

বিদিশা বুঝে উঠতে পারে না প্রধান শিক্ষক ইচ্ছে করেই দুলি নামটি চিনতে অস্বীকার করছেন কি না! দুলির পরিচয় জানিয়ে দ্বিতীয়বার তার বক্তব্য পেশ করতেই প্রধান শিক্ষক উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?

--আমি পাখির আলয় গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষিকা।

--তাই নাকি? প্রধান শিক্ষক অপলক তাকিয়ে থাকেন বিদিশার মুখের দিকে, পরক্ষণে জানতে চাইলেন, একজন নতুন টিচার জয়েন করেছেন শুনছিলাম। তা হলে আপনিই?

--হ্যাঁ। দুলির মা আমাদের হোস্টেলে কাজ করে।

--বুঝেছি। কিন্তু ম্যাডাম, দুলির ছেলের কোনও বাবা নেই তা জানেন?

ভীষ্মদেববাবুর কথার গূঢ় ইঙ্গিতটি বিদিশাকে তেমন বিচলিত করে না, বলল, কেউ একজন অছে নিশ্চয়। কিন্তু দুলি সে-কথা জানাতে পারছে না।

—ম্যাডাম, জানাতে না-পারলে কি করে আমিই বা ভর্তি করার রিস্ক নি? ছেলে ভর্তি হবে, তার বাবার নামের জায়গায় একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন তা কী করে হয়!

বিদিশা তার পক্ষে যুক্তি দেখায়, কেন, মায়ের পরিচয়ে কেন ছেলেকে ভর্তি করবেন না?

—ভালো কথা বললেন, ম্যাডাম। বাবা ছাড়া কি কোনও বাচ্চা জন্মাতে পারে? এ তো আর গরু নয় যে ষাঁড় ছাড়া বাচ্চা হচ্ছে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন পদ্ধতিতে!

বিদিশা অনড় থাকে তার যুক্তিতে, মাস্টারমশাই, বিদেশে কিন্তু এখন মায়ের পরিচয়েই বাচ্চার পরিচয় গ্রাহ্য।

প্রধান শিক্ষক তাঁর যুক্তিতেও অনড়, ম্যাডাম, এটা সুন্দরবন। কলকাতাও নয় যে, বিদেশের যুক্তি খাড়া করে অন্য অভিভাবকদের বোঝাব! সুন্দরবন এখনও সেকালেই পড়ে আছে। আপনি যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন সবাই একই কথা বলবে, বাবার নাম ছাড়া ছেলে স্কুলে ভর্তি করানো যাবে না।

ভীষ্মদেববাবুর যুক্তির সঙ্গে বহুক্ষণ টক্কর দিয়ে কোনও সুরাহা করতে পারে না দুলির ছেলের ভর্তির। হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠে ফেরার পথ ধরে। কখন যে এতক্ষণ সময় পার করে ফেলেছে তা বুঝতেই পারেনি। প্রধান শিক্ষক বারবার 'এটা সুন্দরবন, এটা গ্রামদেশ' ইত্যাদি বলে তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন, কিন্তু বিদিশা ছাড়বার পাত্রী নয়। সে প্রয়োজনে আরও উপরে যাবে এ বিষয়ে লড়তে।

স্কুলে পৌঁছোতে মিনিট দশেক দেরিই করে ফেলল সে। তার এই অকস্মিক অন্তর্ধানের কাহিনি নিয়ে ততক্ষণে অন্য শিক্ষিকারা জ্যোতিষী করতে শুরু করেছেন শাশ্বতীদির ঘরে বসে। সে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে ঢুকতেই লালিমাদি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার, বিদিশা, তুমি কার ছেলের ভর্তি করতে গিয়েছিলে? প্রিম্যারেজ চাইল্ড নাকি?

বিদিশা হাঁপাচ্ছিল জোরে হেঁটে আসার ফলে, বলল, আপনারা জানেন তো ব্যাপারটা।

—জানি মানে?

--দুলির ছেলে যে স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না তা সবাই জানেন।

—তুমি কি দুলির ছেলের ভর্তির তদ্বির করতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। তাইই তো।

লালিমাদি চেঁচালেন, কী সর্বনাশ!

—কেন, সর্বনাশের কী হয়েছে?

শাশ্বতীদি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললেন বিদিশাকে, তুমি দুলির ছেলের ভর্তি নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না, বিদিশা।

বিদিশা আশ্চর্য হয়, সে কি! কেন?

--বাজিতপুরে এত লোক থাকতে কেন দুলির ছেলে ভর্তি হতে পারছে না তা নিশ্চয় তোমার অনুমান করা উচিত।

বিদিশা সবার মুখের দিকে তাকায়। সে বুঝেছে ঠিকই, কিন্তু বুঝতে চাইবে না।

১২

সেদিনই সন্ধেবেলা সেক্রেটারি নিমেষ মিত্র এলেন হোস্টেলে বিদিশার সঙ্গে দেখা করতে। যথারীতি রসমতী এল বিদিশার ঘরে, সিক্রেটারিবাবু এয়েছেন, দিদিমণি।

লালিমাদির কথা মনে পড়ল বিদিশার, বি ওয়্যার অফ সেক্রেটারি।

বিদিশার মুখ শক্ত হয়, আবার কেন?

লোকটি সম্পর্কে এ ক-দিনে যা শুনেছে তাতে তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করার ইচ্ছে হয় না তার। তক্ষুনি ঐশীদির ঘর খোলা পেয়ে তার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল বিদিশা, ঐশীদি, কী করি বলুন তো। লোকটা আবার এসেছে।

ঐশীদি তাঁর ঘরে আপন মনে ছবি আঁকছিলেন ক্যানভাসে। অন্যদিন গুনগুন করে গান করতে থাকেন, আজ নিশ্চুপ।

একটি লোকের ভাঙাচোরা মুখ সেই ক্যানভাসে। বিদিশার আর্ত স্বরে তাকালেন, আবার এসেছে? বিভুঁয়ে চাকরি করতে এলে এই হয় মুশকিল।

কিছু মুশকিল নেই, ঐশীদি। দরকার একটু সাহস।

--কী করতে চাও তুমি।

আপনাকে সাক্ষী রেখে যাচ্ছি দেখা করতে।

বিদিশা চপ্পল খুলে কী যেন দেখল।

ঐশীদি : কী ব্যাপার, চপ্পল দেখছ কেন?

—আমি তো ছন্দিতা নই। আমার হাতে চপ্পল খেলে নিশ্চিত নিধন হবেন।

ঐশীদি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন, বলেন, দেখো, চাকরিটা যেন বজায় থাকে।

বিদিশা · ঐশীদি, রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে ভাইভা দিয়ে চাকরি জুটিয়েছি। চাকরি গেলেই হল!

বিদিশা চোখে বিদ্যুৎ হেনে চপ্পল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৩

বেশ কিছুদিন ধরে ক্যানভাসের উপর কিছু আত্মজৈবনিক ছবি এঁকে চলেছেন ঐশী। জীবনটা ঠিক যেভাবে চলার কথা ছিল তা চলল না। যে মানুষটাকে বিয়ে করেছিলেন, কিছুদিন পরে বুঝলেন হিসেবে কোথাও একটা ভুল ছিল। তাই বেশ কয়েক বছর কলকাতা-বিজিতপুর করার পরে এক সময় ঐশীর মনে হল তিনি আর স্বামীর কাছে প্রিয় নন। কীভাবে যেন ছেলের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে তাঁর এই বিজিতপুরে থাকার সুবাদে। ক্রমশ কলকাতার টান কমছিল তাঁর কাছেও। কলকাতা যাওয়া-আসাতেও ভাটা পড়ছিল ক্রমশ। এখন হয়তো তিন মাস কি চার মাসে একবার। যেন যেতে হয় তাই যাওয়া। কেমন যান্ত্রিক একটা সম্পর্ক এখন। হয়তো বছর সাত-আট আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে গেলে সম্পর্কটা বজায় থাকত। কিন্তু ঐশী ছাড়তে চাননি স্কুলের চাকরি।

বরং এই নিভৃতে ছবি আঁকার জগতে ডুব দিয়ে থাকাটাই তাঁর কাছে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষণীয়।

বিদিশার সঙ্গে সেক্রেটারি আবার দেখা করতে এসেছেন শুনে ঐশী আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছন্দিতা যখন নতুন এসেছিল, ঠিক এভাবেই তার সঙ্গে কথা বলতে আসতেন নিমেষ মিত্র। তারপর কীভাবে যেন তার জালে আটকা পড়ে গেল ছন্দিতা।

নিমেষ মিত্র হয়তো সেভাবেই এগোতে চাইছেন বিদিশাকে লক্ষ্য করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে শাশ্বতীদির ঘরে ঢুকে পড়ল ঐশী : বড়দি, সেক্রেটারিবাবু আবার এসেছেন হোস্টেলে। বিদিশাকে ডেকে কী যেন সব বলছেন?

শাশ্বতীদি বোধহয় স্কুলের প্যাডে কোনও চিঠি লিখছিলেন মনে দিয়ে, মুখ তুলে বললেন, কী বলছেন কিছু শুনলে?

—না, শুনতে হলে ভিজিটর'স রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পাততে হয়। ওটা আমি পারি না।

—আড়ি পাতার কী দরকার? 'কেমন আছেন, নিমেষবাবু?' বলে ঢুকে পড়লেই হয় ভিজিটর'স রুমে।

—ও আমি পারব না। লোকটাকে দেখলেই গায়ের মধ্যে অ্যালার্জি হয়। লালিমাকে বলুন। ও নিমেষবাবুকে ভালো ট্যাকল করতে পারে। এমন কাটা-কাটা কথা বলবে—

—তা পারে। কিন্তু লালিমার ট্যাকল করা মানে লোকটাকে চটিয়ে দেওয়া।

—কী করা যাবে! যে লোক যেমন তার তেমনই ওষুধ।

--কিন্তু সেক্রেটারিকে হাতে রাখাও তো দরকার। আমার পক্ষে দিনের পর দিন কলকাতায় গিয়ে তদ্বির করা সম্ভব না। নিমেষ মিত্রকে বললেই কলকাতা ছুটবে, স্যালারি যাতে আটকে না যায় তার জন্য ডি আই অফিসে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা!

--কিন্তু স্কুলের সেক্রেটারি বলে টিচারদের তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাববেন! আপনি এবার ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে বিষয়টা তুলবেন। এর একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে। যেই কোনও নতুন টিচার আসবে, অমনি তার পিছনে ছুঁকছুঁক করবে। আজ নির্ঘাত বিদিশাকে বলবে, আপনি আমার বাড়িতে দেখা করবেন। জরুরি কথা আছে।

--ঠিক আছে, কথাটা তুমি তুলো। তুমিও তো ম্যানেজিং কমিটিতে টিচার'স রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমি সাপোর্ট করব।

--আমি তুললে কিন্তু যা-তা কাণ্ড হবে। আপনি তো জানেন আমি রেগে গেলে তুলকালাম করি।

তাদের এই কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ রসমতী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল শাশ্বতীদিকে, বড়দি, সব্বোনাশ হয়েচে, বিদিশা দিদিমণিকে নিয়ে সিক্রেটারিবাবু কোথায় যেন বেরোলেন!

--সে কী! বিদিশাকে তো কতবার বারণ করলাম সেক্রোটারির কোনও প্রলোভনে যেন পা দিও না।

ঐশীও বিস্মিত, দ্রুত বাইরে বেরিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন বিদিশা বা সেক্রেটারিকে দেখা যায় কি না। কিন্তু ইঁট-বাঁধানো রাস্তা বরাবর চোখ চালিয়ে কোনও পূর্ণচ্ছেদ খুঁজে পেল না। সামনের অন্ধকার জুড়ে শুধু একটি বিশাল জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

শাশ্বতীদিও বেরিয়ে এসেছেন ঐশীর পিছু-পিছু, কী হল, দেখা পেলে?

--না।

বেরিয়ে এসেছে পৃথা-লালিমাও। চারজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে কিছুক্ষণ কাটাকুটি খেলে। রাত বাড়তে থাকে। শঙ্কার মিশাইলও ছুটে আসতে থাকে চারজনকে লক্ষ্য করে। কী করবে এই পরিস্থিতিতে তা নিয়ে আলোচনা করে চারজন।

ঐশীর স্বর কাঁপতে থাকে, কোথায় গেল বিদিশা? নিমেষবাবুর সঙ্গে কোথায় বেরোল?

লালিমা বললেন, কী সর্বনাশ! ও একা কেন গেল এত রাতে? আমাদের কাউকে তো নিয়ে যেত পারত!

১৪

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বিদিশা ফিরছে না দেখে শাশ্বতী বললেন, মেয়েটার বড়ো সাহস। এখনও তো চেনেনি বাজিতপুরকে। দুপুরে একা-একা গিয়েছিল দুলির ছেলেকে ভর্তির তদ্বির করতে। এখন আবার বেরোল সেক্রেটারির সঙ্গে। পৃথা, তুমি জানতে না, সেক্রেটারি এসেছিলেন?

বাকি পাঁচ টিচার হিম হয়ে বসে আছে হোস্টেলের দরজার কাছে। ঐশী বললেন, বড়দি, কিছু একটা তো করতেই হয়!

পৃথা বলল, চলুন ঐশীদি, আমরা একটু এগিয়ে দেখি বিদিশাকে নিয়ে সেক্রেটারি কোথায় গেলেন!

লালিমাদি : এত রাতে আমরা মেয়েরা-মেয়েরা যাওয়া কি ঠিক হবে? নাইট-গার্ড নেপালকে ডাক না! নেপালের একটা বড়ো লাঠি আছে।

পৃথা : আপনি বড্ড ভীতু, লালিমাদি। পৃথা, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

শাশ্বতীদি : না, তোমরা অল্পবয়সীরা মোটেই একা যাবে না। বরং নেপালকে ডাক।

পৃথা : বরং আমরা সবাই মিলে যাই। পাঁচজন মিলে গেলে কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

পাঁচজনে বেরিয়ে কিছুটা দূর যেতেই দেখা গেল বিদিশা ফিরছে অন্ধকারের মধ্যে।

বিদিশা কাছে আসতে—শাশ্বতী : তুমি কী মেয়ে বলো তো? এত রাতে বেরোতে আছে হোস্টেল থেকে? আমাদের কাউকে না বলে? গাঁ-দেশে রাতের বেলা শুনসান পথ। কত কিছু ঘটে যেতে পারে !

ঐশী : তা তুমি হঠাৎ বেরোলেই বা কেন? তোমাকে কতবার বলেছি নিমেষবাবুর স্বভাবচরিত্র খুব খারাপ।

শাশ্বতীদি বললেন, ছন্দিতা জড়িয়ে পড়েছে, অ.বার তুমিও--

বিদিশার গলায় প্রতিবাদের স্বর, শাশ্বতীদি, আপনি কি আমাকে ছন্দিতার দলে ফেলছেন? বিদিশা কিন্তু অন্য ম্যানুফ্যাকচারারের তৈরি।

শাশ্বতী : হ্যাঁ তা আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছি, কিন্তু রাতের বেলা আর কখনও তুমি কারও সঙ্গে একা বেরোবে না।

ঐশী : তুমি জানো না, বিদিশা, নিমেষবাবু কী ধরনের লোক। তোমাকে জ্যান্ত গিলে খেতে চাইবে!

—আহ্, ঐশী, তুমি বারবার একই কথা তুলো না।

বিদিশা হাঁপাচ্ছিল, বলল, আমি আসলে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনেই হয়নি এটা গাঁ-দেশ।

লালিমা : তা তুমি বেরোলে কেন?

বিদিশা : আসলে কি হয়েছে, শাশ্বতীদি, নিমেষবাবু আমাকে বেশ ধমকাচ্ছিলেন দুলির ছেলেকে ভর্তি করার জন্য আমি এত উদ্যোগ নিয়েছি বলে।

পৃথা : ধমকাচ্ছিলেন? খুব সাহস তো লোকটার?

শাশ্বতীদি : তারপর?

বিদিশা : ভাবলাম কিছু ভালোমন্দ শুনিয়ে দেব। পরক্ষণে নিজেকে সামলালাম, এত তাড়াতাড়ি কিছু করা ঠিক হবে না।

লালিমা : নিমেষবাবু আজ বললেন দুলির ব্যাপাবে মাথা না ঘামাতে?

পৃথা : অদ্ভুত তো!

লালিমা হেসে ওঠে : কি জানি তা হলে কি দুলির ছেলের বাবা কি নিমেষবাবু?

শাশ্বতী : লালিমা, এ সব কথা আলোচনা না-করলেই কি নয়? গাছেরও কান থাকতে পারে!

বিদিশা : বড়দি, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। কেউ ঠিকমতো প্রতিবাদ করে না বলেই এ তল্লাটে এমনটা ঘটে থাকে।

১৫

রবিবারের সকালগুলো আসে অন্যদিনের মতোই রোদ্দুরে হাসকুটি হয়ে। কিন্তু সেদিনটা কাটে তাদের অন্য রকম। বিদিশা তার ঘরে বসেই শুনতে পেল পৃথার গলা। পৃথা চেঁচিয়ে রসমতীকে বলছে, রসমতীদি. বলেছি না, রবিবারে প্রতি দু-ঘন্টায় এক কার চা চাই আমার। লিকার চা, সঙ্গে পরিমাণমতো চিনি আর পাতিলেবু।

রসমতী তখন প্রাণপণে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ব্যস্ত। রবিবারে তার সমস্যা কে কী খাবে তার সুলুকসন্ধান জেনে পর পর তৈরি করে যাওয়া। কেউ লুচি-আলুর দম খাবে তো কেউ ফ্রেঞ্চটোস্ট তো কেউ চাওমিন। বিদিশা অনেকক্ষণ ডায়েরি লিখে ভাবছিল কী-করি কী-করি, সেসময় পৃথা হোস্টেলে আছে জেনে বেরোল ঘর থেকে। পা-টিপে পা-টিপে গিয়ে দেখল ঘরে বেশ জোরে সি ডি চালিয়ে গান শুনছে এক মনে। দু-এক পাক নেচেও নিচ্ছে ইচ্ছে হলে। পৃথা সারাক্ষণ বেশ মস্তিতে থাকে। তাকে চমকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী, খুব গান শোনা হচ্ছে?

বিদিশাকে দেখে পৃথার মুখে পূর্ণচন্দ্রের ছাপাছাপি হাসি, গানই তো জীবন, বিদিশা। গান শুনলে আমার মন খারাপ অর্ধেক ভালো হয়ে যায়।

--তাই নাকি? তোমার মন খারাপ তা তো তোমাকে দেখে বোঝা যায় না!

--কাউকে দেখে কি তার মন ভালো না খারাপ তা বোঝা যায়?

--আমি কিন্তু বুঝতে পারি। এই যেমন তোমার এত মন খারাপ তাও তো বুঝতে পারি আমি।

বিদিশা সতর্ক হয়, কে বলল আমার মন খারাপ! আমি দিব্যি আছি বিজিতপুরে। খাচ্ছি দাচ্ছি কলকলাচ্ছি।

—কলকলাচ্ছি মানে?

--মানে কলকল করে কথা বলছি।

—তার মানে তুমি কলকাতা থাকতে কলকল করে কথা বলতে পারোনি?

বিদিশা আরও সতর্ক হতে চেষ্টা করে। পৃথা তার যন্ত্রণার জায়গাটা ধরে ফেলল নাকি? প্রসঙ্গ বদলাতে বলে, তুমি কিন্তু দু-সপ্তাহ বাড়ি যাচ্ছ না? কেন?

পৃথার বাবা ক্যানসারে ভুগছেন আজ তিন বছর। তার ভাই বিকলাঙ্গ। ভালো করে কথাও বলতে পারে না। তাদের নিয়ে আজ বহুকাল হল পৃথা লড়াই চালিয়ে এখন ক্লান্ত। কলকাতা থাকতে অসুখের বাড়িতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত তার। বলে, বিদিশা, হাসপাতাল, ডাক্তার আর বাড়ি এই নিয়ে আমি জেরবার। ভাগ্যিস স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম।

—কিন্তু শুনলাম তুমি যাওনি বলে তোমার বাবার ডাক্তার দেখানো হয়নি গত সপ্তাহে?

—কে বলল? শাশ্বতীদি? শাশ্বতীদি আমাকে খুব ভালোবাসেন। দরকার মতো ছুটিও দেন। কিন্তু বিদিশা আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ডক্টরস অ্যান্ড হসপিটালস।

বিদিশা কী বলে পৃথাকে মানসিকভাবে শক্ত হতে বলবে বুঝে উঠতে পারে না। কলকাতা থাকতে তার নিজের যন্ত্রণা ছিল একরকম। সে সুন্দরবনে পালিয়ে এসে বেঁচেছে। একেবারে বেঁচেছে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। বুম্বা কালই ফোন করে জানিয়েছে নক্ষত্র তার জেলহাজতের কুঠুরিতে 'বিদিশা বিদিশা' করে পাগল করে তুলছে সেখানকার জেলার আর কর্মীদের। বলেছে, বিদিশাকে তার চাইই চাই।

বিদিশা বারবার করে বলেছে, বুম্বা, ও কিছুতেই যেন আমার ঠিকানা না পায়!

বলেছে বটে, কিন্তু নক্ষত্র এমনই যে, হয়তো জেনে ফেলবে তার বর্তমান অবস্থান। জেল থেকে বেরিয়েই খুঁজতে শুরু করবে পাগলের মতো। যদি কোনও ক্রমে জানতে পারে সে বিজিতপুরে আছে, তখন! তখন কী হবে!

বিদিশা নিজের মনে তোলাপাড়া করতে থাকে দৃশ্যটা। বিজিতপুরের সন্ধান যদি একবার পায় তা হলে নিশ্চিত এসে ধাওয়া করবে তাকে কলকাতা ফিরিয়ে নিতে। তার এই সুখনিবাস ভেঙে তছনছ করে শুরু করবে আগের মতো 'ভালোবাসা'র অত্যাচার।

বিদিশা একা কিছুক্ষণ সেই আতঙ্কের সমুদ্রে অবগাহন করে, তার শরীরে শিরশির করে বয়ে যায় অ্যাড্রেনালিনের প্রপাত, হঠাৎ কোথাও ছিটকিনির শব্দ হতেই চমকে উঠে চিৎকার ছড়িয়ে দিতে চায় বাইরের জগতে।

পরক্ষণে ভুল বুঝে নিবৃত্ত করে নিজেকে। কিন্তু তার ভিতরে এক ভয়ংকর শঙ্কা সারাক্ষণ প্রবাহিত যা সে বুঝতে পারে আসলে নার্ভাস ব্রেকডাউন। দুটো বছরের সাংঘাতিক স্মৃতি মুছে ফেলা সহজ নয়। তা ছাড়া মুছে ফেলবেই বা কী করে যখন নক্ষত্র এখনও প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে জেল থেকে বেরোতে ও বিদিশাকে খুঁজে বার করতে।

পালাতে পালাতে শেষে সুন্দরবনের এই গহনে।

বিদিশার পালিয়ে থাকা একরকম, অর পৃথার পালিয়ে থাকা আর এক রকম। তার বাবা তিল তিল করে এগোচ্ছেন মৃত্যুর দিকে। কিন্তু কেউ জানে না তাঁর কতদিন বা কত মাস বা কত বছর!

--পৃথা, ঠিক করে বলো তো তুমি কেন যাচ্ছ না কলকাতায়! না কি তোমার প্রেমিকের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে?

পৃথা হাসতে থাকে, তুমি কী করে বুঝলে?

--আমার মনে হল।

--তোমার কি পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে?

বিদিশা আবার থমকায়, সে যাই বলুক না কেন তার পিছনে অন্য কাবণ আছে কি না তা যাচাই করতে চাইছে পৃথা।

--পৃথা, তুমি বাড়িতে ফোন কবে বলো সামনের রবিবারে অবশ্যই যাবে।

পৃথা হঠাৎ বলল, তুমিও চলো না, বিদিশা। একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাব।

ভিতরে ভিতরে আঁতকে ওঠে বিদিশা, বলে, না।

--না কেন, বিদিশা? তোমকে জেরা করে যা জেনেছি তাতে তোমার বাড়িতে তো কোনও সমস্যা নেই? চলো না, বিদিশা?

বিদিশা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে, না।

১৬

দুলির ছেলেটা মাঝেমধ্যে রসমতীর সঙ্গে আসে তাদের হোস্টেলে। আপন মনে বেড়ায়, খেলে। বিদিশারা কেউ কিছু খাবার দিলে চমৎকার এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে বলে, তোনরা খুব ভালো।

বিদিশা তাকে গোটা দুই বই কিনে দিয়েছে সে সেই বইদুটো সঙ্গে নিয়ে অসে,

কখনও সুর করে কিছু বলে আগডুম বাগডুম। কখনও বিদিশা বলে, এই বিল্লু, এখানে এসে বোস দেখি।

বিল্লু তার কাছে বসলে সে কখনও অ আ ক খ পড়ায় কখনও একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র।

বিল্লুর পড়ার আগ্রহ দেখে একদিন বিদিশা আবার বেরিয়ে পড়ল এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে। কারও কথা না-শুনে পায়ে পায়ে একদিন সকালে দেখা করল গ্রাম প্রধান জনার্দনবাবুর সঙ্গে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মানুষ ভালোই। বিদিশাকে দেখে বললেন, ও, আপনিই পাখিরালয় স্কুলের নতুন দিদিমণি! হ্যাঁ, কী বলছেন?

বিদিশার কাছে কিছুক্ষণ শুনেই বললেন, হ্যাঁ। জানি তো। কিন্তু ও সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না আপনি। নতুন এসেছেন এখানে।

বিদিশা অবাক হয়ে বললেন, আপনিও এই কথা বললেন? একটি শিশু পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাকে তো সাহায্য করতেই হবে।

—কিন্তু ওর বাবা কে সেটাই তো জানা হল না এতদিনে। একটা বাচ্চা যখন হয়েছে তার তো একটা বাবা থাকতেই হবে। এমনি এমনি তো মায়ের পেটে উড়ে এসে বসেনি বাচ্চাটা!

বিদিশার মুখ লাল হয়।

—এখানে এরকম লক্কা পায়রার মতো অনেক বাবা মোটরবাইক নিয়ে ভটভট করে উড়ে বেড়াচ্ছে সারা দিনরাত। একটু সাবধানে থাকবেন। নইলে কোনদিন দেখবেন হঠাৎ ঝড়ের মতো একটা মোটরবাইক ছুটে এসে আপনাকে পিষে দিয়ে চলে গেল।

বিদিশা চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে গ্রামপ্রধানের দিকে।

১৭

বিদিশা লিখছিল একমনে : নিশ্চিন্তপুরে এসে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হল যা আমার এত বছরের মধ্যেও হয়নি। একটি আদিবাসী কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়েছিল, এই এলাকারই কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির অবৈধ সন্তান, এরকমটা নাকি এই তল্লাটে হয়েই থাকে। কী আশ্চর্য সে তার শিশুসন্তানটি নষ্ট করতে রাজি হয়নি বলে তাকে এখন বইতে হচ্ছে হাজারো দুর্ভোগ। আমি একদিন দুলি নামের সেই কিশোরীটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে তার সন্তানের পিতা, তাতে সে একটি আশ্চর্য উত্তর দিয়েছিল, বলেছিল, পশুদের তো কোনও নাম থাকে না, দিদি।

আমি এই মেয়েটির লড়াইকে শ্রদ্ধা করি। সে বলে, আমার ছেলে তো কোনও দোষ করেনি! সে কেন পড়তে পারবে না?

ডায়েরিতে আরও কিছুক্ষণ হাবিজাবি লেখা চলত হয়তো, হঠাৎ পৃথা এসে ঘরে ঢোকে তার, বিদিশা, দেখবে চলো, ঐশীদি কী চমৎকার একটা ছবি আঁকছে!

--আঁকার সময় না-ই বা গেলাম। তাতে আঁকার ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

--তা ঘটুক না কেন। সেই ভোর থেকে আঁকছেন তো।

বিদিশার ইচ্ছে করছিল না যেতে, কিন্তু পৃথার জোবাজুরিতে আব নিস্পৃহ থাকা সম্ভব হল না তার পক্ষে, ডায়েরি রেখে বলল, ঠিক আছে, চলো।

ঐশীদির ঘরে দুজনে ঢোকে প্রায় হামলার ভঙ্গিতে। একমনে ছবি এঁকে চলেছেন ঐশীদি। ক্যানভাসের উপর একটি শিশুর ছবি। শুধু তাব উপর সাদা রঙের প্রলেপ তাতে তার সুন্দর মুখ সামান্য ঝাপসা।

বিদিশা এর মধ্যে শুনে নিয়েছে ঐশী মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি।

বিদিশা জানে ঐশীদির সঙ্গে তাঁর স্বামীর ছাড়াছাড়ি হওযার কথা। বিয়ের আট বছর পরেও যখন তাঁদের কোনও সন্তান হয়নি তখন সন্তানহীনতা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে চিড় ধরেছিল তাও আজ পাঁচ-ছ বছর। ঐশীদিকে ওঁর স্বামী বলেছিলেন চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় থাকতে। কিন্তু ঐশীদি সাবাদিন একা থাকতেন, হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। একটা বাচ্চা থাকলেও না হয় সময় কাটত তাকে নিয়ে। এখন তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কী করবেন?

ছবিটি দেখে স্বভাবতই বিদিশা ভেবেছিল দারুণ প্রশংসা করবে, বলবে, কেন আপনি একটা প্রদশর্নী করছেন না অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস বা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। কিন্তু ছবিটা দেখে এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পাবে না। মনে হচ্ছিল ঐশীদি অনেক কষ্টের মুখোমুখি হয়ে এই ছবিটা এঁকেছেন।

হঠাৎ বলল বিদিশা : আমি কি তোমাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি, ঐশীদি?

ঐশীদি মাথা নাড়লেন, নাহ্, আর কিছু করা যাবে না!

তাদের কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ মুখ বাড়ায় রসমতী, দিদিমণি, সিক্রেটারিবাবু তোমাকে যেতে বলেছেন ওঁব কাছে। খুব নাকি দরকার আছে।

বিদিশা অবাক হয়, একবার তাকায ঐশীদির মুখের দিকে, আর একবার পৃথার, তারপর বসমতীর দিকে তাকায়, কে বলল তোমাকে?

--বনমালী বলল। তুমি নাকি ঘরে ছিলে না, তাই আমাকে সামনে পেয়ে বলে গেল পাঠিয়ে দিতে।

বিদিশার মাথার মধ্যে এক ঝলক রাগ চলকে ওঠে, কেন আমি কি ওনার চাকর নাকি?

পৃথা : তুমি যেয়ো না, বিদিশা। সেক্রেটারি তাঁর ইচ্ছেমতো ডাকবেন আর আমরা ছুটে যাব এই প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হবে।

বিদিশা : (কিছুক্ষণ ভেবে) কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার যাওয়া উচিত। আমি ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়ব।

--তা হলে লালিমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। লালিমাকে দেখলেই কেমন গুটিয়ে থাকে আজকাল।

পৃথা বলে, লালিমাদি কাটা-কাটা কথা বলে তো।

বিদিশা : কিন্তু লালিমাদির ইনক্রিমেন্ট নিয়ে কী নাকি গোলমাল দেখা দিয়েছে জানেন তো? নিশ্চয় এর পিছনে সেক্রেটারির হাত আছে। আমি বরং একাই ট্যাকল করি সেক্রেটারিকে। আমার তো থাপ্পড় আছেই, চপ্পলজোড়াও তো আছে।

ঐশীদি তার কথায় সায় দেন না, মাথা নেড়ে বলেন, থাক বিদিশা। বরং শাশ্বতীদিকে বলি ব্যাপারটা।

সেক্রেটারির গোল মুখখানা বিদিশার মগজে ঠোক দিতেই তার সারা মুখ জুড়ে ঘোর বিরক্তি। বলে, আপনাকে বলতে হবে না, ঐশীদি। আমিই যাচ্ছি শাশ্বতীদির ঘরে।

বিদিশা রাগে গনগনে হয়ে ঢুকে পড়ে শাশ্বতীদির ঘরে, দেখে শাশ্বতীদি টেবিলে বসে কী যেন লিখছেন। বিদিশাকে দেখে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেন খাতাটা।

শাশ্বতীদির এমন তৎপর হয়ে কিছু লুকোনো দেখে ভারি বিস্মিত বিদিশা, একটু মজাও পায় যেন। অল্প বয়সে কিশোরীরা প্রেমপত্র লেখার সময় কাউকে দেখলে যেমন লুকিয়ে ফেলে ঠিক তেমনটি।

--কী লিখছেন, শাশ্বতীদি ?

--ও কিছু না। হিজিবিজি লেখা।

বিদিশার কৌতূহল, বলে, পৃথা বলছিল আপনি রোজই কিছু না কিছু লেখেন, কিন্তু কাউকে দেখান না কী লেখেন।

শাশ্বতীদি বললেন, রসমতী বলছিল তুমিও নাকি মাঝে মাঝে কী যেন লেখো।

বিদিশা হাসে, আমি তো চিঠি লিখি।

--ও হ্যাঁ, রসমতী বলছিল তুমি চিঠি লেখো। এও বলছিল সেই চিঠি নাকি কখনো ডাকে ফেলা হবে না।

বিদিশা হাসে, রসমতী এত সব মনে রেখেছে তা হলে? আসলে কী জানেন শাশ্বতীদি। কিছু কিছু কথা আছে যা কাউকে বলা যায় না। সব মানুষেরই এরকম কিছু কথা থাকে। তখন সেই কথাগুলো চিঠির আকারে লিখে ফেললে মনের ভার কিছু লাঘব হয়।

শাশ্বতীদি : ধরো, ওরকম কিছু চিঠি আমিও লিখি যা কোনও দিন ডাকে ফেলা হবে না।

বিদিশার চোখে অবিশ্বাস, কিন্তু শাশ্বতীদিকে এখন ঘাঁটায় না। সে শাশ্বতীদির বাড়ির কথা জানতে চায় : আপনিও তো বাড়ি যান না কতদিন হল! কেন যান না?

শাশ্বতীদির গল্প আবার অন্যরকম। তাঁর স্বামী আছে, ছেলে আছে। ছেলে বড়ো হয়ে জলপাইগুড়ি হোস্টেলে থাকে। মায়ের খোঁজ নেয় না। ফোন করলেও বিরক্ত হয়।

এ-কথা সে-কথার পরে বিদিশা হঠাৎ বলে, শাশ্বতীদি, আমাকে আজ সেক্রেটারি ডেকে পাঠিয়েছেন।

শাশ্বতীদিও অবাক, কেন?

--তা কী করে বলব। কিন্তু হঠাৎ এমন ডাকবেনই বা কেন?

- ওটা ওঁর অভ্যাস। ওঁর ধারণা টিচাররা সব ওঁর কর্মচারী।

--কিন্তু এরকম ধারণা হলে তো মুশকিল। একদিন সবাই মিলে বিষয়টা খোলসা করে বলতে হবে ওঁকে।

শাশ্বতীদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, ঠিক আছে, এবার ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে তুলতে হবে ব্যাপারটা। ছন্দিতার কথাও বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু ছন্দিতা নিজেই প্রসঙ্গটা ম্যানেজিং কমিটিতে তুলতে নারাজ।

--কিন্তু ছন্দিতা নারাজ হলেই আমরা মেনে নেব কেন? ব্যাপারটা যদি আমাদের চোখে, এমনকী স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেও দৃষ্টিকটু মনে হয়, তা হলে বিষয়টা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার।

শাশ্বতীদিকে চিন্তামগ্ন হতে দেখে বিদিশা।

১৮

--বাবা, একটা গল্প বলবে?

টমাস একটু আগেই ফিরেছেন নদীপথে অনেকখানি জার্নি করে। খুব ক্লান্ত লাগছিল তাঁর তা টিঙ্কু খেয়াল করেনি।

বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কীসের গল্প শুনবি? বাঘের?

—না, বাঘের গল্প শুনে শুনে কান হেজে গেছে। অন্য গল্প বলো।

—ঠিক আছে, আজই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই বলি।

টমাস একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আজ ভুটভুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম জঙ্গলে কাঠ পাচার হচ্ছে শুনে। হঠাৎ দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রথমে দেখে মনে হয় শুশুক—

--শুশুকের গল্প, বাবা?,

--শোন না। একটা নয়, প্রায় একশো, নীলচে জলে কালোরঙের পিঠ ভাসিয়ে চলেছে বিশাল ঠাকুরানের এক পার থেকে অন্য পারে। তারই একটার পিঠে বসে দুপাশে পা ছড়িয়ে দিয়েছে এক কিশোর। তার উরু থেকে পায়ের পাতা জলের নিচে। শরীর টানটান, খালি গা থেকে ঝরে পড়ছে জলের ধারা, মাঝগঙ্গায় এলে পরে তার চোখে পড়ে দূরে এক বিশাল চর। কচিঘাসে চরের আগাপাস্তলা দেখাচ্ছে নধর খরগোশের মতো, অমন নরমসরম, অমন উমে ভরা। শেষ এসেছিল চারমাস আগে, তারপর এই আবার চলেছে তার দঙ্গল নিয়ে। নদীতে এখন ভাঁটা বলে জলের টান বড়ো দামাল, পূর্ণিমে-অমাবস্যার গোনে জোয়ারেব জল অন্য তিথির চেয়ে ঢোকেও যেমন বেশি, নদীর একূল ওকূল ছাপাছাপি হয়, তেমনি ভাঁটার টান ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিশোরটির দুপা জলে ডুবানো বলে স্রোতের খরটান বুঝতে পারছে।

চোখ একটু ঠাহর করলে বোঝা যায়, এ দঙ্গলটা শুশুকের নয়, এগুলো সব মহিষ। মাঠে 'উদোম' শেষ হলে গরুমহিষের চরে খাবার আব জায়গা থাকে না, তখন মাঠে বীজতলা পড়ে যায়, বর্ষার দু এক পশলা আনাগোনা শুরু হ'তে চাষীবাসী মানুষেবা শোরগোল তুলে চাষের উদ্যোগ করে। গরুমহিষ সব গোয়ালে বাঁধা পড়ে যায়। যে ক'মাস মাঠে ধান থাকে, সেই সময়টুকু কিশোরটির উপর ভার পড়ে মহিষের দঙ্গল নিয়ে চরে ঘাস খাওয়ানোর।

লঞ্চের ডেকে দাঁড়ালে ওপারের বড়ো বড়ো চরগুলো দেখা যায়। এককালে চরগুলোয় মানুষদেব বসবাস ছিল, চরায ভাঙন ধবতে বেশ কিছু লোক তাদের ঘর উঠিয়ে চলে গেছে অন্য দ্বীপে। তবু দশ-পনেরো ঘর লোক এখনো দ্বীপের চারপাশে হলকলমির গাছ বসিয়ে দ্বীপটাকে টিকিয়ে রেখেছে। গরমেণ্টের লোক বলে গেছে ওদের বাস উঠিয়ে দিতে। কিন্তু লোকগুলো কোথায় যাবে, কী করবে ভেবে ভেবে দিশে না পেয়ে এখানেই রয়ে গেছে। আর অনেক চরে তো বসতিই নেই। অত বড়ো দ্বীপখান কেবল ঘাস আর আগাছায় ভর্তি। তা এ দ্বীপখানাও পড়ে থাকে না। যে ক'মাস মাঠে চাষবাস শুরু হয়, গরুমহিষের চরে খাবার জন্য জে.এল.আর.ও অফিস থেকে এই চরখানার ডাক হয়। আর প্রতিবারই নেবুতলার জোতদার বরদা হাজরা চরখানা ডেকে নেয়। তার মস্ত বড়ো খাটাল, একশ গরু-মহিষ আছে, তাদের চরে খাবার মতো এত বড়ো একখানা চর ডেকে নেয় ফি-বছর। আর বরদাবাবুর বাড়ি বারোমাসের রাখালি করে কিশোরটি। বছরের এই ক'মাস সে রোজ ভোর-ভোর একশ গরু-মহিষ তাড়িয়ে নিয়ে যায় চরের মাটিতে। তারপর একসঙ্গে সব ক'টাকে নামায় নদীর জলে, আর একবার জলে নামলে

মহিষগুলো তরতর করে সাঁতরে পার হয় অতোবড়ো নদী। তারপর দিনভর চরেব নতুন কচিঘাস খেয়ে ওদের পেট ভরে ওঠে। সন্ধের সময় আবার নদীর জলে শরীর ভাসায় ওরা। কিশোরটি সারাদিন অমন একখানা বিশাল চরের মালিক। মহিষগুলোকে ঘাসের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সে টইটই করে চরের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। তার হাতে থাকে একখানা মুলিবাঁশের লাঠি, মাথায় তরুলতার টোকা। কখনও চরের দুপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে বসে থাকে চুপচাপ।

দিনভর এতোবড়ো চরখানায় সে একজন মাত্র মানুষ, তল্লাটে তাব উপর খবরদারি করার জনমনিষ্যি নেই। একূল-ওকূল দেখা যায় না এমন নদীর ভিতর এই চরখানায় কেবল পাতিঘাস, হলকনমির ঝোপ, দু-একটা বাবলার গাছ। হেঁতাল ঝোপ রয়েছে একপাশে, সবুজ হলুদ ঝোপের মধ্যে অবিশ্যি এখনও তেমনি কোনো ভয়ডর নেই। সুন্দরবনের জঙ্গল হ'লে অবশ্য তেনাদের ভয় থাকত। এখন এই চরখানার অধীশ্বর হ'য়ে কিশোরটি তার বাহন বুধনিকে বলে, কি রে বুধনি, চল যাই, মালিককে বলে পাশের খালি দ্বীপটাকে কিনে নিই। ওখেনে অনেক ঘাস।

কিছুক্ষণ বলার পব টমাস আনমনা হয়েকিছু ভাবতে থাকেন, সেই অবসবে টিঙ্কু হঠাৎ বলে ওঠে, ধুর বাবা, তুমি ভালো করে গল্প বলতে পাবো না। মা বেশ সুব করে গল্প বলত। কত ফেয়ারি টেলের গল্প বলত!

মায়ের কথা উঠতেই টমাস জোন্সেব মুখটা কেমন তিতকুটে মেরে যায়। টিঙ্কু বুঝতে পারে কথাটা বলা ভুল হয়েছে তার। তক্ষুনি তার প্রসঙ্গ বদলে বলতে থাকে .

--বাবা, জানো, এই স্কুলটা এখন দারুণ ভালো হয়ে গেছে!

টমাস তৎপর হয়ে ওঠে তার মন খারাপে প্রলেপ দিতে।

—তাই নাকি? ক-দিন আগেও বলেছিলি কী বিচ্ছিরি স্কুল! হঠাৎ ভালো হয়ে গেল কী করে?

টিঙ্কু কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে কী যেন ভাবে। তার মনে হয় বিদিশা আন্টি ছিলেন বলেই এই স্কুলটা তার এত প্রিয় হয়ে উঠছে দিনদিন। কিন্তু সে কথা তো আর বাবাকে বলা যায় না! তার বাবার বদলির চাকরি। ঘনঘন বদলি হন বলে ক্লাস সেভেনে ওঠার আগেই চার-চারটে স্কুলে পড়তে হয়েছে তাকে।

তার বাবার চাকরি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। তাই যেখানেই বদলি হয়, কাছে কোনও না কোনও জঙ্গল থাকবেই। তার বাবা বলেন, যদি কখনও হেড অফিসে বদলি হন তবেই কলকাতায় থাকতে পারবে তারা। কিন্তু সে আশা নাকি দূর অস্ত।

তাই জঙ্গলের কাছে বা মধ্যে বাস করাই তাদের ভবিতব্য। আর তার বাবার চাকরি এরকম সব জায়গায় হয় বলেই তার মায়ের ছিল ঘোর অপছন্দ।

মায়ের কথা ভেবে তার খুব মন খারাপ হয় রোজ। মুখে বলে না বাবা দুঃখ পাবেন বলে, কিন্তু মায়ের অভাব তো অনুভব করে দিনের বা রাতের প্রতিটি মুহূর্তে।

মায়ের যেমন পছন্দ হত না জঙ্গলের জীবনযাপন, টিঙ্কুরও পছন্দ হত না স্কুলগুলো। বাবার বদলি হওয়ার সময় প্রতিবারই ভাবত এবার নিশ্চয় ভালো স্কুলে পড়তে পারবে, কিন্তু তার কপালটা এমনই যে, কোনও স্কুলই তার পছন্দ হয়নি। কোনও স্কুলের আন্টি ভালো তো সেখানে ভালো বন্ধু হয়নি। কোথাও দু-তিনটে বন্ধু পেল তো আন্টি পছন্দ হয়নি।

এই নিয়ে সে অনুযোগ করলে তার বাবা বলত, তুই বড্ড খুঁতখুঁতে। নইলে কোনও স্কুলেই তোর মন টেকে না কেন!

কিন্তু টিঙ্কু কী আর করে যদি সেখানে তার মন না টেঁকে!

পড়াশুনো তার খুব প্রিয় হলেও স্কুলের কথা ভেবেই মনটা খুব খারাপ লাগত তার। সে তো সত্যিই খুঁতখুঁতে নয়।

এর আগের স্কুলের আন্টিদের খুব রাগী মনে হত তার। কেউ বা দেমাকি ছিলেন বড্ড। যা শেখাতেন, তার চেয়েও নিজের কথা বেশি বলতেন। অহংকার ঝরে পড়ত তাঁদের প্রতি কথায়। ঠিক সেই সময়, কী বরাত, চাকরিতে আবার বদলি হল বাবার। তখনই নতুন জায়গায় এসে তার এই স্কুলে ভর্তি হওয়া, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন বিদিশা আন্টি।

—জানো বাবা, বিদিশা আন্টি সেদিন আমার সব বইয়ে মলাট দিয়ে দিয়েছেন!

--বাহ্, তা হলে তো আমার অর্ধেক কাজ কমে গেল!

-তোমাকে তো কতদিন ধরে বলছিলাম বাবা, বইগুলো সব ময়লা হয়ে যাচ্ছে, একটু মলাট দিয়ে দেবে? তোমার তো সময়ই হয় না!

—সেদিন তো বললাম সামনের রবিবার দিয়ে দেব। তার আগেই তোর বিদিশা অন্টি দিয়ে দিল তো আমি কী করব!

—বিদিশা আন্টি তো বলল কোনও কাজ 'কাল করব' বলে ফেলে রাখতে নেই। যখনকার কাজ তখনই করতে হয়, নইলে সেই কাজ পড়েই থাকে।

—বাহ্, তোর বিদিশা আন্টি তো বেশ কথা বলেন!

—জানো বাবা, বিদিশা আন্টিরও খুব গাছ করার শখ। সেদিন বনমালীকাকুকে দিয়ে অনেকগুলো দোপাটিগাছ এনে বসিয়েছেন স্কুলের লনে।

—তা বেশ তো। আমি বরং আমাদের দফতর থেকে কয়েকটা বড়ো গাছ এনে দেবখনে। তোদের স্কুলের চারপাশে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া বকুল বসিয়ে দিলে দিব্যি হয়।

পরদিন স্কুলে গিয়ে নাচতে নাচতে খবরটা পরিবেশন করল বিদিশা আন্টির কাছে, জানো, বাবা বলেছে আমাদের স্কুলে নানা ধরনের গাছ এনে দেবে। আমি আর আপনি দুজনে মাটি খুঁড়ে বসিয়ে দেব।

টিঙ্কু দেখে বিদিশা আন্টির মুখ ঝকঝকাচ্ছে গাছের কথা শুনে। বলল, তা বেশ তো। সেদিন এক পিরিয়ড অগে ছুটি দিতে বলব বড়দিকে। সবাই মিলে সেদিন স্কুলে বৃক্ষদিবস করব।

টিঙ্কু হাততালি দিয়ে ওঠে অমনি। বলল, খুব মজা হবে তো তা হলে!

—তোদের কোয়ার্টারে অনেক গাছ বুঝি ?

—হ্যাঁ, বাবার তো জঙ্গলে চাকরি। সারাদিন গাছ নিয়েই বাবার জীবন। কিন্তু সে তো বড়ো বড়ো গাছ। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে টবে কত কত ফুলের চারা বসিয়েছে বাবা।

—বাহ্। খুব ফুল ফোটে নিশ্চয়?

—প্রচুর। এক-এক ঋতুতে এক-একরকম ফুল। বাবা খুব হিসেব করে গাছ আনে যাতে সারা বছর কোনও না কোনও ফুল ফোটে। আপনি একদিন আমাদের কোয়ার্টারে যাবেন?

—সে হবেখন।

—জানেন, আন্টি, সুন্দরবনে পোস্টিং হয়েছে শুনে বাবার সে কি মন খারাপ! কিন্তু আমি সেদিন বলছিলাম, বাবা, ভাগ্যিশ তুমি সুন্দরবনে পোস্টিং পেয়েছিলে, তাই বিদিশা আন্টিকে পেয়েছি। এখন বাবা কী খুশি! বলছিলেন, তা হলে একদিন তোর বিদিশা আন্টিকে দেখতে হয়। আমার দুষ্টু মেয়েকে কী করে বশ করল!

বিদিশা আন্টিকে যতক্ষণ কাছে পায় তার সারা মনপ্রাণ কীরকম স্নিগ্ধ হয়ে থাকে। শরীর জুড়ে একটা আশ্চর্য ভালো লাগা। বিদিশা আন্টি যখন তাদের ক্লাস নেন, সারাক্ষণই খেয়াল রাখেন টিঙ্কুর দিকে ।

টিঙ্কু ঠিকমতো পড়ছে কি না! তার মাথার ফিতে থেকে শুরু করে পরনের পোশাক সব ঠিকঠাক পরা হয়েছে কি না! এমনকী তার হাতের নখ ঠিকমতো কাটা আছে কি না!

টিঙ্কু ঠিকঠাক পড়া পারলে তার মাথায় একটা ছোট্ট টুসকি মেরে কেমন মিষ্টি করে বলেন, গুডগার্ল। এইজন্যেই তো টিঙ্কুকে এত ভালোবাসি!

বিদিশা আন্টিকে পেয়ে টিঙ্কুর মনে হয় এরকম একজন শিক্ষিকার জন্যেই তো সে এতকাল অপেক্ষা করেছে। ততক্ষণে স্কুলের ঘন্টা বেজে গেল।

১৯

ঐশীদি সেদিন ক্যানভাসে ঝুঁকে পড়ে একটা বাচ্চার ছবি আঁকছিলেন খুব মনোযোগ দিয়ে। বিদিশা কিছুক্ষণ দেখল ছবিটা। বুঝতে পারল না কার ছবি।

ঐশীদি সাড় ভাঙতে বললেন, তুমি টিঙ্কুকে একটু যেন বেশি-বেশি ভালোবাসো।

--হ্যাঁ। বেচারির মা নেই। ওর জন্য কেন কে জানে একটু বেশি ফিল করি।

—তুমি কি জানো টিঙ্কুর সব কথা?

বিদিশা : এটুকু জানি ওর মা নেই।

ঐশীদি : মা নেই মানে, মা চলে গেছে ওর বাবাকে ছেড়ে।

বিদিশা চমকে ওঠে, চলে গেছে মানে?

ঐশীদি : অন্য কারও সঙ্গে চলে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর বাবা ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন। তখন টিঙ্কু নাকি এক বছরের। কিন্তু টিঙ্কুর উপর অবিচার-অত্যাচার হবে ভেবে ভদ্রলোক আর বিয়ে করেননি।

বিদিশা চুপ করে থাকে।

ঐশীদি : ভদ্রলোক এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। কী অফিসার যেন।

২০

সকাল হতেই সেদিন হোস্টেলে কী এক তুলকালাম। লালিমাদির গলাই বেশি করে শুনতে পাচ্ছে বিদিশা, বিদিশাকে পইপই করে বলছি এ দেশের রীতিনীতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না, তার ফল ভালো হবে না, তবু ওর জেদ—

বিদিশা কিছুক্ষণ মন দিয়ে অনুধাবন করা চেষ্টা করে কোলাহলের কারণ ও উৎস, শেষে তাকে বেরিয়ে আসতেই হল ঘর থেকে, লালিমাদিকে ঝাড়ু হাতে দেখে বুঝে যায় কী হতে পারে, তবু না-বোঝার ভান করে বলে, কী হয়েছে লালিমাদি?

—কী আর হবে! তুমি জানো, রসমতী আজ কাজ করতে আসেনি?

বিদিশা : দেখছি তো। কী হল কে জানে?

লালিমাদি : যা হওয়ার তাই হয়েছে। ওর বর কাল রাতে খুব একপেট মদ খেয়ে এসে পিটিয়েছে রসমতীকে। বলেছে দেখি তোর কোন বাবা এসে বাঁচায়। আমার নামে স্কুলের দিদিমণিদের কাছে চুকলি কাটা?

বিদিশা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

লালিমা : এদের কাছে জীবনের মানে একরকম। তুমি ইচ্ছে করলেই শোধরাতে পারবে না।

বিদিশা গম্ভীর হয়ে বলে, লালিমাদি, হয়তো রাতারাতি শোধরাতে পারব না, কিন্তু একজন কাউকে তো বলতে হবে বউ পেটানো একেবারেই ওদের ফান্ডামেন্টাল রাইট হতে পারে না।

--কিন্তু ওরা যে-শ্রেণিতে বিলং করে তাদের সমাজে হয়তো এইটেই চল।

--কিন্তু আপনি তো দেখেছেন রসমতীর গালে ঠোঁটে কীভাবে রক্ত জমে ছিল!

--তা দেখেছি। কিন্তু এখন রাতের বাসন কে মাজবে? রান্না কে করবে?

--লালিমাদি, আমরা ক-জন হাত লাগালে কতক্ষণ লাগবে বলুন? আমরা যখন নিজের বাড়িতে থাকি, তখন আমরা সবাই কিছু না কিছু তো করতাম!

লালিমাদি গজগজ করতে থাকেন, তখন তো আর চাকরি করতে হত না।

বিদিশা মুখ গম্ভীর করে রান্নাঘরে গিয়ে বাসন নিয়ে কলতলায় যেতে দেখে পৃথা ছুটে আসে, বিদিশা, রাখো রাখো, সবার বাসন তুমি একা মাজবে কেন? দাঁড়াও, সবাই মিলে--

ছন্দিতাও আসে মুখ ভার করে, বিড়বিড় করে বলে, সব বেশি বেশি।

একটুপরেই দেখা যায় বাসনের কাঁড়ি মাজা শেষ। বিদিশা পরক্ষণে রান্নাঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসে, বলে, পৃথা, আমি সবার জন্য চা করছি। তুমি লালিমাদি আর শাশ্বতীদিকে জিজ্ঞাসা করে এসো তো, কী মেনু হবে আজকের দুপুরে?

রান্নাঘরে চায়ের কাপের টুংটাং ধ্বনি শুরু হতে না হতে বাইরের দরজায় ধাক্কা, শোনা যায় রসমতীর গলা।

পৃথা লাফ দিয়ে উঠে বলে, বিদিশা, মুশকিল আসান এসে গেছে।

সেদিন স্কুলে গিয়ে বিদিশা একটু মনমরা হয়ে থাকে। তার এই পরোপকার করার প্রবণতা কেউ কেউ যে পছন্দ করছেন না তা আজকের সকালের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত। স্কুল থেকে বেরোতেও আজ দেরি হয়ে গেল বলে একটু জোরে হাঁটছিল সে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, সেসময় পাশ দিয়ে যাওয়া ভ্যানরিকশ থেকে 'এই দাঁড়াও, রোকো রোকো' কেউ রিকশ থামিয়ে নেমে এল। বিদিশা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক যুবক, বয়স তিরিশ-বত্রিশ, বিদিশাকে উদ্দেশ করে বললেন, শুনছেন?

বিদিশা অবাক হয়, জিজ্ঞাসা করে, আপনি?

--আমি সৌম্য রায়, এখানকার বয়েজ স্কুলে বাংলা পড়াই। আমরা একটা

ম্যাগাজিন প্রকাশ করছি। শুনলাম আপনি লেখেন-টেখেন। আমাদের পত্রিকায় একটা লেখা দেবেন?

বিদিশা অবাক হয় কম নয়, মুচকি হেসে বলে, আমি লিখি সে কথা আপনাকে কে বলল?

—মানে, ঐশীদি সেদিন বলছিলেন।

—ঐশীদি! ঐশীদি আপনাকে বলেছেন আমি লিখি? কী লিখি?

—কী জানি। ঐশীদি বলছিলেন আপনি নাকি সময় পেলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখেন।

বিদিশা গম্ভীর হয়, দেখুন, সৌম্যবাবু, ঐশীদি বোধহয় আপনার সঙ্গে মজা করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওনার কাছেও লেখা চেয়েছিলেন, তাই নিজের ঘাড় থেকে আপনাকে নামাতে ঐশীদি আমার নাম করেছেন।

সৌম্য হেসে ফেলে বলেন, না, ঐশীদি আমাকে তাঁর ঘাড় থেকে নামাতে পারবেন না। উনি আমাদের পত্রিকার জন্য একটি প্রচ্ছদ এঁকে দিতে রাজি হয়েছেন। কালই আমি ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওঁর কাছ থেকে একটি প্রচ্ছদ আদায় করে এনেছি।

—প্রচ্ছদ?

—হ্যাঁ। উনি তো ভালো ছবি আঁকেন। তাই ওঁর কাছে আবদার করেছিলাম প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার জন্য। উনি তো কিছুতেই রাজি হননি প্রথমে। ওই যে বললেন, আমাকে ওঁর ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করেছিলেন, অনেক না না করার পর শেষে বলেছিলেন, ঠিক আছে এঁকে দেব। এই দেখুন—

সৌম্য রায় তাঁর কাঁধের ঝোলাব্যাগ থেকে একটি ছবি বার করে দেখালেন বিদিশাকে।

বিদিশা, আ রে, এই ছবিটাই তো সেদিন আঁকছিলেন দেখেছিলাম।

—হ্যাঁ, আমাদের পত্রিকার জন্যই আঁকছিলেন। দেখলেন, আমাকে ঘাড় থেকে নামানো অত সোজা নয়।

বিদিশা গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু আমাকে উনি চিনতে ভুল করেছেন। আমি কস্মিনকালেও কিছু লিখি না। লেখা দেওয়া একেবারে অসম্ভব।

—কিন্তু ঐশীদি কি তা হলে মিথ্যে কথা বললেন? উনি যে বললেন আপনি সময় পেলেই নাকি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখেন!

বিদিশা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, লিখি ঠিকই। কিন্তু তা কবিতা নয়।

—তা হলে কি গল্প লেখেন?

—না, গল্পও নয়।

—তা হলে কি প্রবন্ধ? না কি উপন্যাস?

বিদিশা অস্থির হয়ে বলল, না না, ওসব কিছুই নয়। যা লিখি তা ছাপার জন্য নয়। আমি আমার ইচ্ছেমতো যা খুশি লিখি।

--বাহ্, তা হলে তাই দিন না। আমরা রোজনামচা হিসেবে ছাপব। কিংবা ডায়েরি বলে ছাপব। কিংবা লেখাটির নামই দিয়ে দেব, 'যা ইচ্ছে তাই'। পাঠক খুব এনজয় করবে। দেখুন এই মফস্বলে পত্রিকা বার করা কি যে দুঃসাধ্য তা আপনি অনুমানও করতে পারেন না। ভালো লেখা পাওয়াই যায় না। আমি আবার কলকাতার কবি-লেখকদের তেল দিয়ে লেখা আনা পছন্দ করি না। কলকাতার লেখকদের খুব ডাঁট। আমাদের মতো মফস্সলের কবিদের পাত্তাই দিতে চায় না।

বিদিশা অবাক হয়, আপনি কবি নাকি?

--ওই মানে লিখি টিখি আর কি। তা আপনি একটা লেখা দিন না। পৃষ্ঠা নিয়ে ভাববেন না। যত পৃষ্ঠা দেবেন আমরা যত্ন করে ছাপব। আমি খুব ভালো প্রুফ দেখতে পারি। একটাও ভুল পাবেন না আমাদের পত্রিকায়। এই নিন আপনাকে লাস্ট ইস্যুটা দিলাম। পড়ে দেখবেন।

বিদিশা পত্রিকাটা উল্টেপাল্টে দেখে তার পার্স দেখে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিতে গেল সৌম্যকে, এই নিন পত্রিকার দাম।

—আ রে, না না, দাম দিতে হবে না। আপনাকে পড়তে দিলাম। সৌজন্য সংখ্যা।

বিদিশা জোর করে টাকাটা দিল, বলল, লেখা দিতে পারব না, তার উপর পত্রিকার দামও যদি না দিই পত্রিকা ক-দিন পরেই উঠে যাবে যে!

--কিন্তু ম্যাডাম, লেখা আপনার কাছ থেকে আমি নিয়ে ছাড়ব। দেখবেন আমি কীরকম নাছোড় সম্পাদক। আমি আপনাকে কয়েকটা টিপস দিচ্ছি। আপনি আজ বাড়ি ফিরে ডায়েরিটা খুলে বসবেন। যে কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছেন সেটি এবার পাঠক হিসেবে পড়তে থাকুন। দেখবেন কোনও কোনও জায়গায় আপনার ইচ্ছে করবে একটু কাটাকুটি করি। কাটাকুটি করার পর লেখাটা আর একবার একটা সাদা কাগজে নতুন করে লিখুন। কয়েকটা লাইন হয়তো নিতান্তই আপনার নিজের জন্য সেই পঙক্তিগুলো কেটে ফেলুন। তখন দেখবেন আপনার লেখাটা আমার পত্রিকায় ছাপার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

বিদিশা বিস্মিত হয়ে সৌম্য রায়ের ধৈর্য দেখছিল। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এরকম জ্ঞানবিতরণের দৃশ্য দেখে চলমান পথচারীরা তাকাচ্ছিল কৌতূহলী চোখে।

সৌম্য রায় অতঃপর হাসলেন, যদি আপত্তি না থাকে রিকশয় উঠে বসুন। আপনি বাজিতপুরে যাবন তো। আমিও যাব। কোনও অসুবিধে নেই। আপনিও বাংলার টিচার, আমিও।

বিদিশা বেশ অবাক হচ্ছিল যুবকটির সহজ সারল্যে। বলল, না। আমার

ভানরিকশয় চড়ার ব্যাপারে রিজারভেশন আছে। আপনি যান। আমি হেঁটে চলে যাব এই পথটুকু। রোজই যাই তো।

--যস্মিন দেশে যদাচারঃ। শ্লোকটি ভুলে যাননি নিশ্চয়?

পরক্ষণে,তবে হ্যাঁ। আপনি ওই যে কামিন মেয়েটির অবৈধ সন্তানের স্কুলে ভর্তির জন্য চেষ্টা করছেন তাতে আমাদের মরাল সাপোর্ট আছে। কোনও দরকার হলে বলবেন।

সৌম্য রায় ভ্যানরিকশয় পা ঝুলিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যটি কিছুক্ষণ দেখল বিদিশা। নাছোড় কবির হাত থেকে আপাতত রেহাই পেয়ে হাঁটতে শুরু করল নিজের পথে।

২১

গ্রাম প্রধানের কাছে দরবার করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পরদিন থেকে বিদিশা ভাবছিল অতঃ কিম? সে কি সত্যিই হেরে যাবে কিছু গ্রাম্য মানুষের ভয় ও সংস্কারের কাছে! সৌম্য রায়ের কথাগুলো মনে তোলাপাড়া করছিল কখনও। বলেছিল সাহায্য করবে যদি দরকার হয়। কিন্তু বিদিশা এ বিষয়ে কারও সাহায্য নেবে না এমন ভেবে রেখেছে। কারও সাহায্য চায়ওনি এখনও।

অনেক টালবাহানার পর বিদিশা একদিন শাশ্বতীদিকে বলল, আমার টিফিনের পরের পিরিয়ডটা অফ আছে,তার পরের পিরিয়ডটা পৃথা চালিয়ে নেবে বলেছে। ওর অফ আছে তখন। আমি একটু বিডিও-র সঙ্গে দেখা করতে বেরোচ্ছি। একেবারে হোস্টেলে ফিরব।

—বি ডি ও! শাশ্বতীদি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না কেন !

টিফিনের ঘন্টা বাজতেই বিদিশা নদী পেরিয়ে পৌঁছোল স্থানীয় বি ডি ও অফিসে। শাশ্বতীদির কাছেও আপাতত বিষয়টি ভাঙল না। শুনেছিল ব্লকের নতুন বিডিও একজন মহিলা। খুব সহানুভূতিশীল। তাঁর চেম্বারের বাইরে বসে একটা স্লিপ পাঠাল অপেক্ষমান আর্দালিকে দিয়ে। চেম্বারের বাইরে টাঙানো নেমপ্লেট দেখে নামটাও মুখস্থ করে নিল বি ডি ও-র, পর্ণা সান্যাল। ডাক পড়তেই ঢুকে পড়ল চেম্বারের ভিতরে। এক ঝলকেই অনুমান করে নিল বয়স সাতাশ-আঠাশ। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। চেম্বারের ভিতরে ঢুকে তাকে দেখে বিদিশা সাহস পায়, চশমা-পরা জিজ্ঞাসু চোখের তরুণীটিকে বলে, যাক, সুন্দরবনে এসে একজন মহিলা বিডিও পাওয়া যাবে সমস্যার কথা জানাতে ভাবতেই পারিনি। আমার সুন্দরবনে পোস্টিং হয়েছে শুনে বাবা-মায়ের কী দুশ্চিন্তা! বলে কিনা ওখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির।

পর্ণা : মন্দ বলেননি। তবে মানুষ-বাঘ বা মানুষ-কুমিরই বেশি।

বিদিশা হেসে ফেলে, জিজ্ঞাসা করে, তা আপনি সামলাচ্ছেন কী করে এত সব?

পর্ণা সান্যাল হেসে ফেলে, বলে, চেয়ার মেক্স্ এ পার্সন। প্রথম-প্রথম নার্ভাস লাগত, ভাবতাম এতসব বাঘা-বাঘা লোকের হ্যাপা সামলাব কী করে? তারপর এখন সয়ে গেছে। বাঘা-বাঘা লোকেরাই এখন আমাকে দেখে ভয় পায়, কেউ কেউ বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে।

বিদিশা মুগ্ধ হয় বি ডি ও মেয়েটির সাহসিকতা দেখে, বলল, বেশ বললেন তো!

--আসলে বাঘা লোকগুলোর অনেকেরই কিছু দুর্বলতা থাকে। মুখে বাঘ মারলেও ভিতরে ভিতরে দুর্বল। সেটা বুঝে ফেলতে পারলেই তাকে কাবু করে ফেলা সম্ভব। বাঘা এম এল এ পর্যন্ত আমাকে সমীহ করে কারণ তারা চোখ গরম করে শুধু আইন ভাঙতে চায়। আমি নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করব না সেটা বুঝিয়ে দিতেই সব টাইট।

--কিন্তু সুন্দরবনে আসার আগে তো জায়গাটাকে চিনতেন না! তখন পোস্টিং নিতে ভয় করেনি?

—ভয় কেন করবে! বরং বলতে পারেন আমি সুন্দরবনে পোস্টিং নিয়েছি স্বেচ্ছায়। আমাদের ব্যাচের ছেলেরা যখন সুন্দরবন অ্যাভয়েড করতে চাইছিল আমি বলেছিলাম আমি সুন্দরবনে পোস্টিং নিতে রাজি।

বিদিশা সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে বলে, আপনার সাহসের তারিফ করতেই হয়।

—আসলে ছোটো থেকে আমি পুরষদের সঙ্গে সমানে লড়তে হবে ঠিক করেই জীবন শুরু করেছি। মেয়েরা কারও চেয়ে কম নয় এটা প্রমাণ করতে হবে তো।

--যা বলেছেন। সবাই ভয় দেখায়, মেয়েরা দূরে চাকরি করতে যাচ্ছে শুনলে বারণ করে।

—একজ্যাকটলি।

বিদিশা অতঃপর বিডিওর কাছে দুলি-বৃত্তান্ত বলতে শুরু করে একটু একটু করে। সব শুনে পর্ণা বললেন, কিন্তু বাবার নাম লেখেনি বলে ছেলেকে ভর্তি করবে না তাই বা কীরকম কথা? ঠিক আছে আমি দেখছি।

পরক্ষণে বললেন, কিন্তু সত্যিই জানা যাচ্ছে না বাচ্চাটার বাবা কে? স্ট্রেঞ্জ!

বিদিশা হাসল, নিশ্চয় জানে। মা জানে না তার বাচ্চার বাবা কে তা তো হতে পারে না। কিন্তু কিছুতেই ওদের মুখ দিয়ে বলানো যাচ্ছে না। না-বলতে চাইলে কী করা যায় বলুন তো?

—তাও তো বটে। নিশ্চয় খুব চাপ আছে বেচারির উপর। হয়তো অর্থবান কেউ আছে এই কুকীর্তির পিছনে।

—হয় অর্থবান কিংবা ক্ষমতাবান কেউ।

কিন্তু অর্থবান হোক বা ক্ষমতাবান। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়তা জানেন নিশ্চয়?

বিদিশার মুখ শক্ত হয়, জানি। কিন্তু সবাই যদি সে কারণে পিছিয়ে যায় তা হলে তো প্রতিবাদ শব্দটাই ডিকশনারি থেকে বাতিল করতে হয়!

বি ডি ও হাসলেন, যাক, অন্তত একজন কাউকে পাওয়া গেল যে আমার কথার প্রতিধ্বনি করছে।

বি ডিও-র চেম্বারের বাইরে অনেক ভিজিটর। বিদিশাকে খুব বেশি সময় দিতে পারলেন না, বললেন, ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি বাচ্চাটা যাতে ভর্তি হয়।

বিদিশার মনে আশার আবর্ত। বি ডি ও যখন বললেন নিশ্চয় তার লড়াইয়ের একটা পরিণতি হবে। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কোনও ভাবে বিল্লুর বাবা কে তা জানা যায় না!

পর্ণা হাসলেন, জানা যাবে না কেন! পুলিশ যখন অপরাধী ধরে তাকে থার্ড ডিগ্রি দিয়ে আদায় করে নেয় তার কুকর্মের কথা। এখানে অপরাধী নিশ্চয় দুলি নয় যে তার উপর থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে কথা আদায় করতে হবে। কিন্তু কোনও না কোনওভাবে কথা বার করা যায় নিশ্চয়। তারপর ডি এন এ টেস্ট করলেই ধরা সম্ভব হবে অপরাধীকে। কিন্তু তার আগে দুলির নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তবেই এ কাজে হাত দিতে হবে।

বিদিশা ঘাড় নাড়ে, বলে, অপরাধী নিশ্চয়ই এতটাই ক্ষমতাবান যে তার ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না দুলি বা তার মা রসমতী।

বি ডি ও অফিসের ভিড় ঠেল বিদিশা বেরিয়ে আসে বাইরে। চারদিকে নানা ধরনের লোক গিজগিজ করছে কম্পাউন্ডে। তার মধ্যে হঠাৎ তার চোখে একটি দৃশ্য গিঁথে গেল বড়শির মতো। তাদের স্কুলের সেক্রেটারি নিমেষ মিত্র একদিকের বেঞ্চিতে বসে কী যেন গুজগুজ ফুসফুস করছে আর একটি যণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে। দুজনে পরামর্শ করতে এতই ব্যস্ত যে, বিদিশার উপস্থিতি খেয়াল করতেই পারল না।

ভাগ্যিশ পারল না। বিদিশা স্কুলের ক্লাস না করে কেন বি ডি ও অফিসে এসেছিল তা নিয়ে হয়তো একটা শোকজ নোটিস ধরিয়ে দিতেন তাকে।

কিন্তু নিমেষ মিত্র কেন বি ডি ও অফিসে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু কী উপায়!

২২

বিদিশা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ থম হয়ে রইল পর্ণা। এরকম অবৈধ সন্তানের ইতিহাস খুঁজতে তাকে এখন কী প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত তা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে চাইল নিবিষ্ট হয়ে। বিষয়টা তার কাজের মধ্যে পড়ে কি না তাও ভাবল কিছুক্ষণ। বিডিওর কী করণীয় তা নিয়েও ধন্দে পড়তে হয় প্রায়শ। সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী তার কাজ এক রকম। কিন্তু তার বাইরে হাজার সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিদিন। তার এক সিনিয়র কলিগ একদিন বলছিলেন বি ডি ও মানে ব্লকের ভগবান। তাকে আলপিন থেকে এলিফ্যান্টের সমস্যা মেটাতে হতে পারে।

সকালে উঠেই স্বামী-স্ত্রী মারামারি করে রক্তাক্ত হয়ে তাদের দাম্পত্য সমস্যা মেটাতে চলে আসে কখনও। সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত ব্লকটিতে বি ডি ও পর্ণা সান্যালের পোস্টিং হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। মহাকালের হিসেবে এই সময়টা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না, কিন্তু পর্ণার মনে হচ্ছে বেশ অনেকদিন হয়ে গেল পৃথিবীর কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে অনন্তকাল। প্রথম-প্রথম মনে হত শনি-রবিবার ছুটির দিনে ঘুরে আসে তার বাড়ি রাণাঘাটে। কিন্তু মুশকিল হল বিডিও-র চাকরিটা এমনই যে, তাতে কোনও ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই। বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার হঠাৎ একটা মেসেজ এসে পৌঁছোবে কোনও না কোনও বড়ো সাহেব কোনও একটা কাজ দেখতে সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত ব্লকটিতে আসছেন শনিবার সকালে। শুধু কাজ দেখবেন তা নয়, তিনি হয়তো শনিবার এলাকার কাজ দেখে একটা মিটিং ডেকে দিতে বলেন রবিবারে। মাঝের সময়টা তিনি কোনও একটি লঞ্চ নিয়ে জঙ্গল পরিদর্শনে বেরোবেন সপরিবারে। তাঁরা গেলে কী আর আপত্তি পর্ণার, কিন্তু বড়ো সাহেবরা এলাকায় বিচরণ করলে তার মতো ছোটো সাহেবরা কী করে স্টেশন লিভ করা কথা ভাবে! তার জীবনের যাবতীয় শনি-রবিবারগুলো এভাবেই চাকরির ভোগে চলে যায়, তার আর বাড়ি ফেরা হয়ে ওঠে না।

জেলাশাসক মাঝেমধ্যে কলকাতায় মিটিং ডেকে শহরের মানুষজন দেখার সুযোগ করে দেন বটে, কিন্তু মিটিং শেষ হতে প্রায়শ সন্ধে, তারপর মনে পড়ে পরদিন ব্লকে তার দু লক্ষ কাজ বাকি,তখন আর মাথায় রাণাঘাট থাকে না, মগজের কুঠুরিগুলোতে বিজবিজ করতে থাকে হয় সেল্প হেল্প গ্রুপ, না হয় পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং, না হয় জওহর রোজগার যোজনা।

তার মা প্রায়ই টেলিফোন করেন, কী রে, চাকরি পেয়ে যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি!

পর্ণা উত্তর দেয়, মা ডুমুরের ফুল অনেক পুরোনো উপমা। তোমরা যখন স্কুলে

পড়তে তখন বোধহয় বাংলা ব্যকরণে পড়তে হত। বরং নতুন যে-গ্রহটা অবিষ্কৃত হয়েছে, যার অবিষ্কারের ফলে প্লুটোর গ্রহত্ব খারিজ হয়ে গেল, তার নাম বলো--যার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কখনও দেখা যাবে না।

--কিন্তু বিয়েটিয়ের কথাও তো ভাবতে হবে। বয়স তো হল!

তার কত বয়স হল তাও এই ব্লকের চাকরির পাল্লায়পড়ে ভুলতে বসেছে পর্ণা। সাতাশ-টাতাশ। এম এ পাস করে, ডবলিউ বি সি এস দিয়ে সাকার হতে এরকম বয়স তো হবেই।

মায়ের দ্বিতীয় প্রশ্নটা বহুদিন ধরেই তার উদ্দেশে মিশাইলের মতো ধাবিত হয়, এতকাল বলে এসেছে চাকরিবাকরি পাই তারপর--

এখন আর সেই অজুহাত দেওয়া চলে না। এখন তাকে অন্য কোনও হাতের কথা ভাবতে হয়, বলল, তুমিই তো বলো জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতার হিয়ে। বিধাতার হিয়ায় যখন মনে হবে পর্ণার বিয়ে দিতে হবে, তখন এমনিই হবে। তবে, মা, বিয়ে করে কী হবে! আমি পড়ে থাকব সুন্দরবনে, আর আমার বর পড়ে থাকবে কলকাতায় কি ব্যাঙ্গালোরে কি দিল্লিতে। তাকে কি বিয়ে বলে!

বিয়ের কথায় তার এক বান্ধবী সুরঞ্জনা সান্যালের কথা মনে পড়ল। সে একটু মুখ আলগা ধরনের। বলে, বিয়ে করে যদি রাতের বেলা বরের সঙ্গে জাপটাজাপটি করে শুতেই না পারলাম তো বিয়ে করে কী হবে!

কিন্তু বিদিশার রেখে যাওয়া সমস্যাটি নিয়ে ভাবনপ্রক্রিয়া শুরু করার আগেই তার ঘরে ঢুকে পড়লেন নিমেষ মিত্র। লোকটিকে বেশ ভালোই চিনে ফেলেছে এ ক-মাসে। বলা যায় থ্রি ইন ওয়ান। তিনি একটি গার্লস' স্কুলের সেক্রেটারি, রাইসমিলের পার্টনার, আবার রেশন দোকানের মালিক। লোকটি বরাবর বিনয়ের দশ অবতার, কিন্তু খবর নিয়ে জেনেছে লোকটি অসম্ভব ধূর্ত, আর নিজের ধান্দা ছাড়া অন্য কিছু জানে না।

নিমেষ মিত্র কী কারণে এসেছে তা আঁচ করার চেষ্টা করলেন তার গুটিগুটি প্রবেশ করার ধরন দেখে।

--কী খবর নিমেষবাবু, কী মনে করে?

--ম্যাডাম, নেহাতই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।

--কী সৌজন্য দেখাতে এসেছেন?

--এমনিই এলাম, ম্যাডাম। এসেছিলাম থানায়, তা ভাবলাম একবার ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে যাই।

--কিন্তু ম্যাডামের একদম সময় নেই আপনার সঙ্গে খোসগল্প করার। যদি কোনও দরকার না থাকে, তা হলে--

--ম্যাডাম, আপনার দরবারে এসেছি যখন, একটা ছোট্ট আবেদন জানাই।

--কী আবেদন? পর্ণা চোখ তীক্ষ্ণ করে লোকটা কী ঝেড়ে কাশে!

—ম্যাডাম, আপনি তো জগু সর্দারকে চেনেন?

—না, তেমন চিনি বলে মনে হচ্ছে না।

—জগু সর্দার ফরেস্টের পারমিট নিয়ে গাছ কাটে।

--বুঝেছি সেই লোকটা যে দশ নৌকোর পারমিট নিয়ে তিরিশ নৌকো কাঠ কাটে।

—না ম্যাডাম, কথাটা সর্বৈব মিথ্যে।

—মিথ্যে নয়, নিমেষবাবু। জগু সর্দার এর অগে বার দুই তার নৌকোর দঙ্গল নিয়ে কাঠ পাচার করেছে। এই নিয়ে তৃতীয় দফায় তার মাল নিয়ে পালাচ্ছিল সেই সময় টমাসের লোক তার নৌকো আটক করেছে।

--না ম্যাডাম--

—নিমেষবাবু, একটা ডাকাতের হয়ে আপনি আর দ্বিতীয়বার তদ্বির করবেন না। লোকটিকে আমরা খুঁজছি। আপনার তো অনেক ব্যবসা। আপনি তদ্বির করলে আমরা ধরে নেব এটাও বেনামে আপনারই ব্যবসা। সে ক্ষেত্রে জগু সর্দারকে খুঁজে না পেলে আপনাকেই অ্যারেস্ট করতে বলে দেব থানার অফিসারকে।

নিমেষ মিত্রর দুমড়ে যাওয়া মুখটা দেখতে বেশ উপভোগ করছিল পর্ণা। ততক্ষণে নিমেষ মিত্র চেম্বারের বাইরে হাওয়া।

২৩

তাদের বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে ঠিক যখনই একটা অ্যারোপ্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ হয়, তখনই টিঙ্কু বুঝতে পারে তার স্নানে যাওয়ার সময় হয়েছে। তার মা যতদিন ছিলেন টিঙ্কুর এতসব ভাবার দরকার হত না। ঘড়িতে দশটা বাজলেই মা ডাকত, টিঙ্কু, বইখাতা গুছিয়ে স্নান করবে এসো।

এখন তাকে নিজেই দেখতে হয় ঘড়ি. কেন না তার বাবা প্রায়ই সকালে উঠে বেরিয়ে যান জঙ্গল তদারকি করতে। কে কখন বিনা পারমিটে গাছ কেটে নিয়ে গেল, কে জঙ্গলে ঢুকে বাঘ বা হরিণ মারতে গেল তা নিয়ে বাবার সারাদিন মাথাব্যথা।

বেলা দশটা বাজলে তাকে নিজেই স্নান করে নিতে হয়, কাজের মাসি চপলা ভাত বেড়ে দিলে খেয়ে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে যেতে হয় স্কুলে। কিন্তু মুশকিল হয় কখন ঘড়িতে দশটা বেজে যায় তার খেয়াল থাকে না সে নিবিষ্ট থাকে তার

বইয়ের পড়ায়। নচেৎ বিদিশা আন্টির কথা ভাবতে ভাবতে সে হয়ে পড়ে সংবিৎহীন। তাই এখন সে স্নান করার সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছে অ্যারোপ্লেনের শব্দের সঙ্গে। গোঁ গোঁ শব্দ হলেই তার সাড় ভাঙে। অমনি লাফিয়ে উঠে প্রস্তুত হয়।

এখন সকালে উঠেই সে অপেক্ষা করে কখন স্কুলের পাঁচিল পেরোলেই দেখতে পাবে বিদিশা আন্টিকে। যতক্ষণ সে বিদিশা আন্টির কছে থাকে কী অদ্ভুত ভালো লাগে তার! আবার তাঁর কাছ থেকে চলে এলেই কী মন খারাপ! স্কুলের ছুটি হলে প্রতিদিন আরও বিষণ্ণ হয়ে যায় তার মন। গোটা একটা সপ্তাহ বিদিশা আন্টিকে দেখতে পাবে না বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। সারাদিন বাড়িতে বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে সে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে।

তার অমন বাইরে চাউনি দেখে তার বাব বলে ওঠেন, কী অত ভাবিস সারাক্ষণ?

টিঙ্কু অমনি লজ্জা পেয়ে যায়। বাবাকে তো আর বলা যায় না সে এতক্ষণ ঝুম হয়ে বিদিশা আন্টির কথা ভাবছিল। বলল, স্কুলটা আরও এক ঘন্টা আগে হলে ভালো হত।

বাবা হেসে বলেন, তাই তো দেখছি! তুই যে এমন স্কুলে যাওয়ার জন্য এত ঝুলোঝুলি করবি তা কখনও ভাবতেই পারিনি। খুব ভালো বন্ধু পেয়েছিস বুঝি?

—খু—ব। টিঙ্কু সুর টেনে বলে, আন্টিও এত ভালো!

বাবা অবাক হন, আন্টিকে বুঝি তোর খুব পছন্দ হয়েছে?

—হ্যাঁ। বিদিশা আন্টি কী যে ভালো তা তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না ! টিঙ্কু বলেই ফেলল অবশেষে।

—তোকে খুব ভালোবাসেন বুঝি?

—খু—ব। টিঙ্কু হেসে ফেলল হঠাৎ, তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

বাবা অবাক হন, তাই নাকি! কী অবাক কাণ্ড!

টিঙ্কু লাল হয় লজ্জায়, একদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাঁকে না দেখলে আমার কী যে মন খারাপ হয়!

—যাক, এখন মেয়ের স্কুলের পড়ায় মন এলে ভালো হয়।

— কেন বাবা, আজকাল তো খুব পড়ি।

—তাও তো দেখি। তবে কেমন পড়িস তা দেখা যাবে পরীক্ষার রেজাল্ট হাতে পেলে।

টিঙ্কু বেশ জোর গলায় বলে, দেখে নিও। বিদিশা আন্টি বলেছেন স্কুলের রেজাল্ট ভালো করতে হবে।

বলে সে আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার কী মনে হতে তার খুব মন খারাপ। আর কয়েক মাস পরেই তাদের বার্ষিক পরীক্ষা। তারপর সে উঠবে নতুন ক্লাসে। তারপর তার বাবা যদি আবার বদলি হয়ে যান! তাহলে তো তাকে চলে যেতে হবে অন্য কোনও শহরে। ভর্তি হতে হবে নতুন কোনও স্কুলে!

কথাটা মনে হতেই তার বুকের ভিতরটা চিনচিন করে ওঠে। নতুন শহরে তো আর বিদিশা আন্টি থাকবেন না! তখন সেখানে কি আর তার মন টিকবে!

চকিতে টিঙ্কুর চোখের দুটো কোণ চিকচিক করে ওঠে। হয়তো আর একটু ভাবলেই তার চোখ দিয়ে গড়াতে থাকবে জল। এরকম মাঝে মাঝেই হচ্ছে আজকাল।

আজও জল এসে যাচ্ছিল চোখে, হঠাৎ পড়ার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দেয়। তার বাবা হয়তো এখনই আবার এসে ঢুকবেন এই ঘরে। তখন তার চোখে জল দেখে বেশ একটা হইচই শুরু করে দেবেন নির্ঘাত। তার আগেই মুছে ফেলতে হবে তার কান্নার রেশ।

কিন্তু কী যে মুশকিলে পড়ে গেছে টিঙ্কু ! বিদিশা আন্টি তাকে এত ভালোবাসেন যে কখনও মনে হয় তার বাবাও বোধহয় তাকে এত ভালোবাসেন না! কিন্তু তা তো আর সত্যিই হয় না। তবু বিদিশা আন্টি তাকানোয়, কথাবার্তায়, স্নেহ-ভালোবাসায় এমন একটা জাদু মাখানো থাকে যে, টিঙ্কুর সারাক্ষণ মনে হয় বিদিশা আন্টির সঙ্গেই যদি সারাক্ষণ থাকতে পারত!

২৪

সকালে উঠে নানা ব্যস্ততা থাকে হোস্টেলের সবাইকার। রসমতীর ব্যস্ততা আরও বেশি। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই একদিন বিদিশা রসমতীকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছ কেন? নিশ্চয় ক্ষমতাবান কেউ হবেন তিনি। কিন্তু তাই বলে তিনি তো আর পার পেয়ে যেতে পারেন না!

রসমতী চুপ করে থাকে। বলে, বলতে পারব না, দিদি।

সেদিন দুলিও এসেছে তার মাকে সাহায্য করতে। সঙ্গে বিল্লু।

বিদিশা দুলিকে নিয়ে পড়ে, বলে, তুমি ঠিক করে বলো তো ওর বাবা কে?

দুলি শাড়ির আঁচল জড়াতে থাকে আঁচলে। কোনও কথা বলে না।

বিদিশা প্রথমে অনুরোধ করে, তারপর চাপ দেয়, কিন্তু না-বাতাসী না-একাদশী কেউই মুখ খোলে না। বিদিশাকে ভারি অসহায় দেখায়। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, তা হলে আর তোমার ছেলের স্কুলে ভর্তি হওয়া হল না। আমি নিজে গিয়ে বি ডি ও-কে

বলে এলাম। তিনি কথা দিলেন দেখবেন। কিন্তু এত সপ্তাহ হতে চলল তিনিও কোনও খবর পাঠালেন না।

কথাটা কানে গিয়েছিল শাশ্বতীদির, বেরিয়ে এসে বললেন, বিদিশা, দুলির উপর চাপ দিও না। ও যে বলতে পারছে না তার নিশ্চয় কারণ অছে। হয়তো রুজিরোজগারের পথটাও বন্ধ হয়ে যাবে তা হলে! তুমি তখন ওকে সাহায্য করতেও পারবে না।

বিদিশার চোখ ফেটে জল আসতে চায়, বুঝতে পারে তার এই লড়াইয়ে কাউকে পাশে পাওয়া অসম্ভভ। বরং সবাই তাকে নিষেধ করছে এ বিষয়ে আর এগোতে।

শাশ্বতীদি আরও বললেন, ওর বাবা কে তা জানতে না চেয়ে বরং চেষ্টা করো যাতে ওর মায়ের পরিচয়ে ভর্তি করার চেষ্টা করো।

২৫

টিঙ্কু একদিন ক্লাসে ভালো করে পড়া না-পারায় ভারি ক্ষুণ্ণ হলেন বিদিশা আন্টি. বললেন, কী ব্যাপার, সেদিন তোকে এত ভালো করে পড়াটা বুঝিয়ে দিলাম, আর আজই ভুলে গেলি!

বিদিশা আন্টির গলায় সামান্য বকুনির স্বর, আর তাতেই ভারি কান্না পেয়ে গেল টিঙ্কুর। বিদিশা আন্টি দি তো কোনও দিন বকেন না তাকে! আজ কেন বকলেন!

তার কান্না দেখে বিদিশা আন্টি হেসে ফেললেন, বা রে, ভারি মজার মেয়ে! পড়া পারিসনি বলে বকেছি, আর তোর চোখে জল এসে গেল! তোকে একটু বকতেও পারব না? না বকলে কি ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়?

পরক্ষণেই তাকে ডেকে নিলেন বুকের কাছে, দূর বোকা! তোকে কি আর সত্যি সত্যি বকেছি? ঠিক আছে, সামনের দিন নিশ্চয়ই ঠিক করে দেখাতে পারবি।

টিঙ্কুর চোখে জল, মুখে হাসি, বলল, আন্টি, একদিন আমাদের বাড়ি যাবেন?

—আমাকে? ও মা কেন? আমার কি সময় আছে কোথাও যাওযার? দেখিস নে কত কাজ আমার!

টিঙ্কুর অমনি চোখে জল।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখি একদিন সময় পাই কখন!

পরের দিন টিঙ্কু একেবারে নিখুঁতভাবে পড়া তৈরি করে শুনিয়ে দিল বিদিশা আন্টিকে।

বিদিশা তার মাথার ঝুঁটি নেড়ে তাকে শাবাশ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন আগের দিন পারিস নি হ্যাঁ?

টিঙ্কুর মুখ খুশিতে ছাপাছাপি, বলে, বলব?

—বলবি তো?

— আসলে হঠাৎ মনে হল বাবা যদি আবার কোথাও বদলি হয়ে যায় তো আপনাকে তো আর পাব না। আগের দিন আপনাকে ছেড়ে তাকে অন্য শহরে চলে যেতে হবে এই চিন্তাতেই পড়ায় মন বসেনি।

বিদিশা শুনে অবাক হয়, সে কি রে, পাগলি? তা তো হতেই পারে। তোর বাবার যদি বদলির চাকরি হয় সেরকমটা তো হতেই পারে। তা ছাড়া কয়েক বছর পরে মাধ্যমিক পাশ করলে তোকে তো চলে যেতেই হবে অন্য স্কুলে। এখানে ভালো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নেই। যাও অছে তাও বয়েজ হাইই স্কুল। হয়তো বাইরের কোনও শহরেও যেতে হতে পারে। তাই তো নিয়ম জীবনের। আর তুই কিনা তাই নিয়ে ভেবে আকুল হচ্ছিস?

টিঙ্কু চুপ করে থাকে।

বিদিশা: তুই বরং আরও মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আমাকে যদি সত্যিই ভালোবাসিস তবে ভালা রেজাল্ট করলেই তা হবে আমাকে দেওয়া তোর শ্রেষ্ঠ উপহার।

২৬

পৃথা একমনে বই পড়ছে, তাকে ডাকতে এল লালিমাদি, কী রে মেয়ে, সারাক্ষণ বই পড়ে কাটিয়ে দিলে জীবনের বাকি দিকগুলোর কিছুই জানা হবে না যে!

পৃথা বই মুড়ে রাখে, বলে, কী করব, আমার যে টিভি দেখতে একদম ভালা লাগে না। শুধু সিরিয়াল আর সিরিয়াল! আমি আবার সিরিয়াল একদম মনে রাখতে পারি না। খেই হারিয়ে যায়।

লালিমাদি হাসে, কিন্তু তুই যে উপন্যাসগুলো পড়িস, সেগুলো কি একবারে পড়ে শেষ করতে পারিস?

—তা কেন হবে? যখন সময় পাই তখন কিছুটা করে পড়ি।

লালিমাদি : তার মানে উপন্যাসগুলোও তুই ধারাবাহিক করে নিয়ে পড়িস। আজ যেখান শেষ করলি কাল বা পরশু তার পর থেকেই তো তোকে পড়তে হয়। তখন ঠিক আগের পড়াগুলো মনে থাকে?

পৃথা হেসে ফেলে, তা থাকে।

-তা হলে টিভির সিরিয়াল মনে রাখার চেষ্টা করলেই মনে থাকে। আসলে তোর কনসেন্ট্রেশনের অভাব হচ্ছে।

বিদিশা ঢুকল ঠিক সেসময়, আগের কথার খেই ধরে বলল, আর কনসেন্ট্রেশনের কী দোষ বলুন, লালিমাদি। বেচারি সাত বছর ধরে প্রেম করছে, কিন্তু বিয়ে করতে পারছে না।

লালিমাদি : বিদিশা, তুমি বোধহয় পৃথার সব কথা জানো না।

পৃথা : বিদিশা সবই জানে, লালিমাদি।

--ও, বিদিশাকে তোমার আত্মজীবনী বলা হয়ে গেছে তা হলে?

--লালিমাদি, বিদিশা বোধহয় কায়দা করে আমাদের সবারই আত্মজীবনী জেনে নিয়েছে এর মধ্যে। ও আসলে সবাইকে একটু করে খুঁচোয়। খুঁচিয়ে সবার কথা জেনে নেয়।

বিদিশা : পৃথা, তুমি কিন্তু তোমার প্রেমিকের সঙ্গে খুব অবিচার করছ। বেচারি যদি রেগে মেগে অন্য কোথাও বিয়ে করে নেয়, তুমি তার দোষ দিতে পারবে না।

পৃথা মুখ নিচু করে রাখে। একটু পরেই বিদিশা খেয়াল করল পৃথার চোখে জল।

২৭

এক শালিক-ডাকা সকালে বইখাতার মধ্যে ডুবে থাকা টিঙ্কুর দিকে নজর পড়ল টমাস জোন্সের। টিঙ্কু আজকাল এত মন দিয়ে তার পড়ার বইয়ে নিবিষ্ট থাকছে যে, টমাস বললেন, কী রে, তোর বিদিশা আন্টি যে তোকে একদম বশ করে ফেলেছে!

টমাস কয়েকদিন ধরে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁর রাজত্ব সামলাতে। কিছুদিন ধরে লক্ষ করছেন সুন্দরবনের জঙ্গল দ্রুত সাফ করে ফেলছে চোরাকারবারির লোকজন। আজকাল প্রায়ই বেরোচ্ছেন সারপ্রাইজ ভিজিট করতে। তখনই ধরা পড়ে যাচ্ছে কাঠবোঝাই বোটগুলো। অধিকাংশেরই পারমিট নেই। যাদের পারমিট আছে তাদের পারমিটের মেয়াদ অনেকদিন আগেই গেছে উতরে, তবু সেই পারমিট নিয়েই কেটে চলেছে মূল্যবান কাঠ।

হঠাৎ টিঙ্কুর স্কুলের হাফ-ইয়র্লি পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখলেন বেশ ভালো ফলাফল করেছে হাফ ইয়ার্লিতে। গত অ্যানুয়ালের চেয়ে অনেক ভালো।

রেজাল্ট দেখিয়ে হাসি-টইটম্বুর মুখে টিঙ্কু বলল, জানো বাবা, তবু বিদিশা আন্টি আমাকে ডেকে কী বললেন জানো?

--কী বলেছে তোর বিদিশা আন্টি?

--আমাকে ডেকে বললেন, টিঙ্কু, আমার কিন্তু ধারণা ছিল আরও ভালো ফল

হবে। সবাই তো আর ফার্স্ট হয় না। কিন্তু অন্তত প্রথম তিনজনের মধ্যে তো হতে পারিস।

টিঙ্কু যেমন চমকে উঠেছিল, টমাসও অবাক, তিনজনের মধ্যে?

—জানো বাবা, বিদিশা আন্টি বলেছেন, না-পারার কী আছে! আমি বুঝতে পারি তোর মাথাটা খুব পরিষ্কার। কিন্তু তুই ভীষণ অন্যমনস্ক। পড়তে বসে নিশ্চয়ই অন্য কথা ভাবিস!

--তোর বিদিশা আন্টি তো তোকে বেশ চিনেছেন! তুই যা ফাঁকিবাজ!

--জানো বাবা, টিঙ্কু টমাসের কোলে মুখ লুকোতে চায়, বিদিশা আন্টি কি আমার মুখ দেখে সবই বুঝতে পেরে যান! আমি যে সত্যিই অন্যমনস্ক, পড়ার টেবিলে বসে বারবার মনে পড়ে বিদিশা আন্টির কথা ভেবেই তাও কি জেনে ফেলেছেন তিনি!

টমাস তাঁর মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, যাক, তোকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা ছিল, তোর বিদিশা আন্টি আমাকে রেহাই করে দিয়েছেন

—জানো বাবা, বিদিশা আন্টি বলেছেন, দ্যাখ টিঙ্কু, আগামী কয়েক বছর খুবই কঠিন বছর। শুধু স্টার নম্বর পেলেই যে ভালো রেজাল্ট হল তা আর এখন বলা যাবে না। ভালো স্কুলে ভর্তি হতে হলে চাই হাই স্টার। সেরকমই লক্ষ রেখে পড়তে হবে সামনের কয়েকটা বছর। নইলে সবাই বলবে বিদিশা আন্টি ওকে আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন বলেই রেজাল্ট ভালো হয়নি।

--ঠিকই বলেছেন। তা তুই কী উত্তর দিয়েছিস?

--বলেছি, চেষ্টা করব, আন্টি।

টমাস মেয়ের কপালে একটা আদর দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাইক নিয়ে। কিছুটা এগিয়েছেন হঠাৎ একজন আগন্তুক তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন দু-হাত মেলে। টমাস খুব জোরে ব্রেক করে দাঁড়ালেন লোকটির সামনে। একমুখ দাড়ি, পরনের পোশাকও তেমন পরিষ্কার নয়। লোকটি খুব বিপজ্জনকভাবে পথ অবরোধ করেছে তাঁর। আর একটু হলেই তাঁর বাইকের ডগায় গুঁড়িয়ে যেত লোকটি। পাগল কি না কে জানে?

—কী চাইছেন আপনি?

লোকটি সটান দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, পাখিরালয় গার্লস হাই স্কুলটা কোন পথে?

টমাস বেশ অবাক হলেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—আপাতত কলকাতা থেকে।

—কলকাতা থেকে? টমাস নামলেন বাইক থেকে, কাউকে খুঁজছেন?

--হ্যাঁ। একজন মিস্ট্রেসকে।

টমাস রীতিমতো বিস্মিত, কাকে খুঁজছেন?

--তাতে আপনার কোনও দরকার আছে?

--কী নাম আপনার?

--আমার নাম জেনে আপনার কী লাভ? ধরুন বারিদ বিশ্বাস।

--ধরুন কেন? ওই নামটা আপনার নয়?

--কী জানি আমার নাম কি না! জেলের ভাত খেয়ে বাপের নাম খগেন হয়ে গেছে, আর নিজের নাম বারিদ।

টমাস ঘটনাটার মধ্যে বিপদের গন্ধ শুঁকে সতর্ক হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ। জিজ্ঞাসা করলেন, কোন মিস্ট্রেসের খোঁজে এসেছেন?

--আপনি কি সবাইকে চেনেন নাকি? ধরুন তার নাম নীলিমা সেন।

টমাস কিছুক্ষণ লোকটিকে আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করলেন, তারপর বললেন, অপনি আমার বাইকে উঠে বসুন। আপনাকে গার্লস স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছি।

--না না, আমি বাইকে উঠতে পারিনে। আমার পায়ে ক্র্যাম্প ধরে ।

টমাসের ব্যস্ততা ছিল খুব। এখনই ভুটভুটি নিয়ে বেরোতে হবে সাইটে। জগু সর্দারের লোকজন আরও আরও নৌকো বোঝাই কাঠ নিয়ে ফিরবে এরকম খবর আছে তাঁর কাছে। সঙ্গে পিস্তলটি নিয়েছেন কারণ জগু সর্দারের লোকজন খুবই ভয়ংকর তা জেনে গেছেন ইতিমধ্যে। তিনি বাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অফিসের দিকে। সেখানে বাইক রেখে রওনা দেবেন নদীঘাটের দিকে ।

২৮

সুন্দরবনের মাটিতে রোদ্দুর বোধহয় একটু বেশি চকচকায়, কিন্তু তেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটছে না গায়ে। বিদিশা হনহন করে যাচ্ছিল স্কুলের দিকে। পৃথারা সবাই বেরিয়ে গেছে একটু আগেই, তাদের ধরার জন্য তার এই ব্যস্ততা। হঠাৎই পিছন থেকে একটি মোটরবাইক শব্দ করে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষল তার গায়ের কাছে। বিদিশা ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাতেই বছর পঁচিশের যুবকটি বাইক দাঁড় করিয়ে নেমে এল তার সামনে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে বলল, আপনি কি আমাদের গার্লস স্কুলের ইংরেজির টিচার?

বিদিশা যুবকটির কথার ভঙ্গিমায় বিস্মিত হয়, বলল, আপনি কে?

যুবকটি চোরা হাসি হেসে বলল, আমার একটা নাম ছিল বটে, কিন্তু সেই নাম আমিও ভুলে গেছি, গাঁয়ের লোকেও ভুলে গেছে। এখন আমার নাম রাজা।

বিদিশা যুবকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বলল, আপনার কি আমার কাছে কোনও দরকার আছে?

—না। আপনার কাছে আমার কোনও দরকার নেই। বরং লোকেরই দরকার পড়ে আমার কাছে।

বিদিশা বোঝার চেষ্টা করছিল যুবকটির উদ্দেশ্য। জিজ্ঞাসা করল, আপাতত আপনার কাছে আমার কোনও দরকার নেই।

বিদিশা আবার হনহন করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। একটু পরেই যুবকটি বাইক চালিয়ে এসে হাজির হল বিদিশার কাছে। বাইক থেমে না নেমে তার পাশে পাশে চলতে শুরু করল, বলল, কী হল, আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম, আপনি ওরকম করে চলে এলেন কেন?

বিদিশা কথা না-বলে চলতেই থাকে।

যুবকটি আবার ভটভট শব্দ করে এগিয়ে আসে, কী ব্যাপার, আপনি অত ডাঁট দেখাচ্ছেন কেন? আপনি নাকি এখানে মাস্টারি করতে এসে দেশসেবা শুরু করে দিয়েছেন?

বিদিশা থমকে দাঁড়ায়, বলে, আপনি যাবেন, না আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব?

যুবকটি বাইক থেকে নেমে এগিয়ে আসে বিদিশার দিকে।

বিদিশা একটুও না নড়ে দাঁড়িয়ে থাকে যুবকটির চোখে চোখ রেখে।

কী আশ্চর্য, শুধু তার চাউনি দেখেই বীরপুঙ্গব কিছুক্ষণ পরে বাইকে শব্দ তুলে চলে গেল নিজের গন্তব্যে। সাহসই পেল না কিছু বলতে।

২৯

রাত অনেকখানি হলে রোজই কিছু না কিছু লেখা চাই বিদিশার। সব শব্দ থেমে গেলে বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে বিদিশা লিখতে থাকে, 'হঠাৎই জীবনের উপর রাগ করে চলে এসেছিলাম নিশ্চিন্তপুরে নিশ্চিন্ত হতে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে গ্রামের এক অন্য রূপ ফুটে উঠছে আমার সামনে। গ্রামের আপাতশান্ত রূপের অন্তরালে প্রবাহিত হচ্ছে এক জটিল জীবনধারা। এখানকার কিছু মানুষ এলাকাটাকে তাদের জমিদারি বলে গণ্য করে। তাদের হাতে কিছু টাকা আছে। টাকার পিছু পিছু নাকি ধাওয়ার করে ক্ষমতা, তাই বাকি মানুষকে তারা মানুষ বলে মনে করে না। ...

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে লিখে বেশ ঘুম পায় তার। কিন্তু জানে বিছানায় শরীর ভাসানোর পর এই ঘুমপরি তার চোখ থেকে পাখনা মেলে উড়ে পালাবে কোথাও। আজকাল তার ভালো করে ঘুম হয় না। নক্ষত্র নামের গ্রহটি আজও তার পিছু

ঘুরছে ছায়ার মতো। কেন কে জানে, কিছুতেই তার মুখোমুখি হচ্ছে না। হয়তো টিঙ্কুর বাবা টমাস জোন্স তাকে এমন কিছু বলেছে তাইই।

সে একরকম মন্দের ভালো। কিন্তু বিদিশা মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছে তার মুখোমুখি হতে। একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে তাকে। বিষয়টা এখনও কারও কাছে বলতে পারেনি লজ্জায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পারবে না তাও বুঝেছে। ভাবছিল শাশ্বতীদিকেই প্রথমে বলবে। তাঁর প্রতিক্রিয়া জেনে তারপর বাকি সবাইকে। সে তো কোনও অপরাধ করেনি। তার এই বিয়েটা তার কাছে নিতান্তই লজ্জার। টিঙ্কুর কাছে শুনতে পায় লোকটা এখন একেবারে উন্মাদ। এই উন্মাদের সঙ্গে সে দু-বছর ঘর করেছে। প্রতিটি মুহূর্তই মনে হয়েছে নরকযন্ত্রণার সমতুল। কোনও ক্রমে প্রাণ নিয়ে বেঁচে পালিয়েছে এখানে। জানে না এখানেও বেঁচে থাকতে পারবে কি পারবে না। হয়তো এমনও হতে পারে নক্ষত্রর জামার নীচে লুকোনো রয়েছে সেই ছুরিটা যা দিয়ে খুন করতে গিয়েছিল এক নিরীহ অটোচালককে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বাইরে পা দিতেই দেখে দাঁত মাজছে পৃথা, বিদিশাকে দেখেই বলল, কী বিদিশা, তোমাকে নাকি রাজা আটকেছিল পথে?

বিদিশা : কার কাছে শুনলে কথাটা?

—কার কাছে আবার! সারা এলাকায় রটে গেছে সংবাদটা।

বিদিশা ভুরুতে ঢেউ তোলে, কিন্তু রাজা নামের লোকটা কে?

—রাজাকে চেনোনি এখনও? এখানকার হিরো। নিমেষ মিত্রর ডান হাত। নিমেষ মিত্রর রাইস মিলের পার্টনার। তাকে দিয়েই তো যত অকর্ম করায় নিমেষ মিত্র।

—তা হলে তো বেশ ঘ্যাম লোক?

—অবশ্যই।

—আগে জানলে নতুন চপ্পলটা পরে বেরোতাম।

--অতটা সাহস দেখানোটা বোধহয় ভালো হত না। ওর হাতে অনেক ইয়ং ছেলেছোকরা আছে যারা ওর কথামতো চলে, ওর কাছে কাজ করে।

—আমি তো ওর কাছে কাজ করি না।

—ওর ধারণা এই এলাকায় যারাই থাকে, তারা ওদের আন্ডারে কাজ করে। ভাবভঙ্গিটা অন্তত তাই।

-- তা হলে এর পরদিন যখন দেখা হবে তখন বিষয়টা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা লড়ে চাকরি পেয়েছি।

পৃথা : তা তোমার সঙ্গে প্রথম মোলাকাত কেমন হল?

—ভালোই। বলতে চাইলাম, বেশি আদেখলেপনা দেখালে ভালো করে কড়কে দেব।

--বললে এরকম কথা?

--বলতে হয়নি। তার আগেই তিনি মানে মানে বিদায় নিলেন।

--তবু সাবধানে থেকো, বিদিশা। নিমেষবাবু জেনে গেছেন তুমি বিল্লুর ছেলের বিষয়ে অনেক দূর এগিয়েছে। উনি নিজে পিকচারে না থেকে হয়তো রাজাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবেন। ।

৩০

টমাস জোন্স ভুটভুটির উপর দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন জঙ্গলের খাঁড়িপথগুলো। এক-একটা দ্বীপের চারপাশ ঘুরে এলে দেখা যাবে বেশ কয়েকটা খাঁড়ি এঁকেবেঁকে সেঁধিয়ে গেছে জঙ্গলের ভিতর। একজন ফরেস্ট গার্ড কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে বলছিল, স্যার, বজ্জাতগুলো এই খাঁড়িপথের ভিতর দিয়ে ঢোকে নৌকো নিয়ে। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না ভিতরে কী ঘটে চলেছে নিঃসাড়ে!

চাকরিজীবনে কম জঙ্গল তো আর ঘুরলেন না টমাস। আর এই জঙ্গলের জীবনযাপন পছন্দ হল না বলেই তার স্ত্রী দীপিতা শেষপর্যন্ত তাকে ছেড়ে, তাদের মেয়েকে ফেলে রেখে অন্য কারও সংসার করতে চলে গেছে এই কিছুকাল হল।

টমাস সারা চাকরিজীবন লড়াই করেছেন নানা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। চোরাশিকারিদের সঙ্গে লড়াইই বেশি করতে হয়েছে। কখনও দুর্নীতিগ্রস্ত বসদের সঙ্গেও। তাতে বেশিরভাগ সময় জিতেছেন, কখনও হারেননি তা নয়। কিন্তু দীপিতা যেদিন তিন লাইনের একটি চিঠি লিখে চলে গিয়েছিল, টমাসের জীবনে তার চেয়ে বড়ো হার আর নেই।

নদীপথে ঘুরতে ঘুরতে সেই সব কথা পুনর্বার তোলাপাড়া করছিলেন নিজের মনে। মাঝেমধ্যে ফরেস্ট গার্ডরা বলছিল মাঝিকে--খাঁড়ির মুখে দাঁড় করাতে ভুটভুটিটা। খাঁড়িগুলো এমনই সরু যে ডিঙিনৌকো সেঁধিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভুটভুটি আদপেই নয়।

টমাস খাঁড়ির দিকে দু-চার দণ্ড মনোনিবেশ করে বলছিলেন, দ্যাখো তো, বিশে, কিছু ঠাহর করতে পারো কি না!

--না, স্যার। ডিঙি সেঁধুলে ঠিক গাছপালায় দাগ রেখে যেত।

টমাস সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ফিরতে শুরু করেন নিঃস্বের মতো। কিন্তু সারদিনে অভিজ্ঞতা হয়েছে কম নয়। কতরকম নৌকো আর ডিঙিই যে দেখলেন সারাদিন ধরে! নানারকম জাল বিছিয়ে বা জাল ফেলে মাছ ধরছে রকমারকম

মাছমারারা। জলের এই অপর্যাপ্ত রুপোলি শস্যের সন্ধানে ভোর নেই সন্ধে নেই রোদের তাপে পোড় খাওয়া মাঝি হাল বেয়ে বেয়ে ঘুরছে নদীতে। কখনও কিনারে দাঁড়িয়ে খ্যাপ্‌লা-জাল ছুড়ে অর্জন করে তার জীবিকা, কখনও ডিঙি মাঝনদীতে নোঙর করিয়ে টানা জাল বিছিয়ে দেয় এপার-ওপার। নদীর দুপারে দুটো কালোরঙের 'ভাসা' ছাড়া জালের অস্তিত্ব প্রায় বোঝা যায় না।

--স্যার, ওই দেখুন, সাবার।

ভুটভুটিতে সারাদিন টহল দেওয়ার ফুরসতে ফরেস্ট গার্ডরা তাঁকে চেনাচ্ছিল সুন্দরবনের জলসংসার।

একাধিক ডিঙি পাশাপাশি নোঙর করে সুন্দরবন অঞ্চলে যে মাছধরার আয়োজন লক্ষিত হয় তাকেই 'সাবার' বলে। মাত্‌লা, ঠাকুরানি, রায়মঙ্গল, সপ্তমুখীর মতো উত্তাল ও আকারে বিশাল নদী থেকে শুরু করে বাঁশতলা, কালনাগিনী, হাবেলী, মৃদঙ্গভাঙা, হাতানিয়া দুয়ানিয়া, কইকলমারী, সুইয়া, বিদ্যা, পীরখালি, গোমর, গোসাবা, ঝিলা, হরিণভাঙা প্রভৃতি ছোট বড় অসংখ্য নদী আর খাঁড়ির সমাবেশে সমগ্র সুন্দরবন এলাকার নদীমাতৃক রূপ ও সম্পদ বাঁচিয়ে রেখেছে এখানকার মানুষকে। এইসব নদীতে এত বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়, তিথি-নক্ষত্র ও কোটাল বিশেষে এত পর্যাপ্ত পরিমাণে যে তাতে জীবন ধারণ করে কত না পরিবার।

বিশে নামের গার্ডটি ভুটভুটিটা নিয়ে গেল একটা বড়ো সাবারে। তখন সদ্য জাল তোলা হয়েছে জল থেকে। জালের মধ্যে তখন খলবল করছে যেসবা মাছেরা তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল বিশে।

—স্যার, এইটে আইড়, এইটে কৈ-ভোল, এইটে খল্‌সে

--স্যার এই দেখুন কত রকমের কাঁকড়া।

কাঁকড়া এখানকার একটি সহজলভ্য ও সুস্বাদু খাদ্য।

শুধু কি কাঁকড়ার স্বাদই ভালো!

সুন্দরবনে আসার পর থেকে কত রকমের মাছই না খেলেন টমাস!

পারশে, ট্যাংরা, ভাঙ্গড়, ভেট্‌কি, পায়রাচাঁদা, তপ্‌শে, গুর্জালি, খরকুল্লো, আমাদি, খয়রা, বাগদা, ফ্যাঁশা নেহারি, চন্দনা ইলিশ, কাঁচকেল ইলিশ, রূপবতী পম্পলেট ...

কত আর নাম মনে রাখা যায়!

সুন্দরবনের মাটি যতখানি উর্বর, এ অঞ্চলের নদীর জল তার চেয়ে অনেক বেশি ফলবতী। টমাস সেদিন পড়ছিলেন একটি রিপোর্ট, তাতে সোনার খনির চেয়েও কেন রুপোর খনি এখানে মূল্যবান তা দেখাতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা

দেখিয়েছেন এক একর জমিতে যে মূল্যের ধান উৎপাদন হওয়া সম্ভব, এক একর জমিতে মাছের ভেড়ি তৈরি করলে তার দশগুণ মূল্যের উৎপাদন হতে পারে।

সুন্দরবনের জলসংসার দেখতে দেখতে তাঁর মন পড়েছিল সকালে দেখা সেই পাগলপারা লোকটির মুখ। কাকে খুঁজতে এসেছে সেই পাগল!

৩১

মাঝেমধ্যে ভোরগুলো ভারি পবিত্র হয়ে ধরা দেয় বিদিশার কাছে, তখন পৃথিবীটা মনে হয় ভারি সুন্দর। কখনও আবার বয়ে নিয়ে আসে দুঃসংবাদ। হঠাৎ এদিন সকালে তার মোবাইল বয়ে নিয়ে এল তেমনই এক দুঃসংবাদ, বিদিশা অন করে, হ্যালো, কে, বুম্বা? কেমন আছিস তোরা? মায়ের শরীর ঠিক আছে? বেশি খাটাখাটুনি যেন না করে। সামনেই যখন রিটায়ারমেন্ট, তখন অত অফিস-অফিস যেন না করে। তোর পড়াশুনা ভালো হচ্ছে তো? মায়ের রিটায়ারমেন্টের পর তুইই তো সংসারের কর্তা। আমি বেশ ভালোই আছি। সারাক্ষণ দিনে বাঘ রাতে কুমির। সত্যিই, ইয়ার্কি মারছি না। তবে কিনা সেই কবিতাটা মনে আছে? বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি / আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরই মাথায় নাচি। এখানকার জীবনটা অনেকটা সেই রকম।

হঠাৎ কী যেন শুনে বিদিশার গলায় যেন কাঁটা ফুটে যায়, কেঁপে যায় স্বর, কী বললি? নক্ষত্র রাতের অন্ধকারে জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেছে?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে বিদিশা। বেশ অনেকদিন আতঙ্কে থাকার পর মাত্র কয়েকদিন সে ভাবছিল হয়তো বেঁচে গেল নক্ষত্রের ফাঁস থেকে। জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

--পুলিশ হুলিয়া জারি করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কিনারা করতে পারেনি।

বিদিশা মোবাইলটি হতে নিয়ে স্থাণু হয়ে রইল কতক্ষণ কে জানে!

সেদিনই বিডিও পর্ণা সান্যালের কাছ থেকে চিঠি পেল বিদিশা, বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান। বিদিশা যদি তাঁর অফিসে আসে তো—

বি ডি ও-কে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আসার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত, তবু কোনও সংবাদ না-পেয়ে খুব অভিমান হচ্ছিল পর্ণা সান্যালের উপর। চিঠি পেতেই রাগ জল। শাশ্বতীদিকে বলে বিদিশা বেরিয়ে পড়বে বলে মন করে। কিন্তু বুম্বার ফোন পাওয়ার পর থেকে তার ভিতরে শিরশির রতে শুরু করেছে সেই আতঙ্কের টুকরোটা। নক্ষত্র এমনই সাংঘাতিক, হয়তো কোনও ভাবে জোগাড় করে ফেলবে তার ঠিকানা। হয়তো বুম্বাকেই ভয় দেখিয়ে, কিংবা তার মায়ের উপর চড়াও হয়ে

বলবে, 'দিন দেখি বিদিশার ঠিকানা। আমার হাত থেকে কোথায় পালাবে?' বিদিশা একবার ভাবল বুম্বাকে ফোন করে জানতে চেষ্টা করে নক্ষত্র কোনও ভাবে তাদের কাছ থেকে বিদিশার ঠিকানা পেয়েছে কি না! পর মুহূর্তে ভাবল, হয়তো এখনই তার পিছনে তাড়া করবে না।

তাড়াহুড়ো করে দুটো মুখে দিয়ে বিদিশা নদীর কিনারে পৌঁছে অপেক্ষা করছিল ফেরিনৌকোর জন্য। বি ডি ও অফিসে তাকে পৌঁছোতে হবে ঠিক দশটায়। কাজ সেরে ফিরতে অন্তত সাড়ে এগারোটা। একটা ক্লাস অফ যাবে, কী আর করা। লঞ্চে নদী পার হয়ে ওপারে গেল বি ডি ও অফিসে। খুব ভিড়। কী নাকি একটা মিনিকিট দেওয়া হচ্ছে চাষিদের।

বিদিশা স্লিপ পাঠাতেই বি ডি ও-র পিয়ন এসে ডেকে নিয়ে যায় তাঁর চেম্বারে। পর্ণা তাকে দেখে হাসলেন একঝলক, আসুন, মিস সেন।

মিস শব্দটা এখনও চমকে দেয় বিদিশার দু-বছরের বিবাহিত মন। কিন্তু তার জন্য ঢের চমক অপেক্ষাসকরছিল বি ডি ও-র চেম্বারে। ঢুকেই দেখে সেই প্রাইমারি স্কুলের টিচার বিভীষণ দাস।

বিদিশা একটা চেয়ার টেনে বসতেই একটুও সময় নষ্ট করলেন না পর্ণা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলেন কী কারণে তিনি ভর্তি করতে পারছেন না দুলির ছেলেকে।

বেশ কর্তৃত্বই ছিল বি ডি ও-র প্রশ্নে, পর্ণা মাত্র কয়েকমাস সুন্দরবনে এলেও এখানকার মানুষজনের হালচাল সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু বিভীষণ দাসও টেঁটিয়া ধরনের, বললেন, ম্যাডাম, আপনি ডেকেছেন সে ভালো কথা। কিন্তু একজন যুবতী গর্ভবতী হল, কিন্তু সে জানে না কার ঔরসের সন্তান, এটা কি সমাজের পক্ষে ভালো কথা?

বিডিও বিদিশার সঙ্গে চোখোচোখি করে।

বিদিশা উসখুস করছিল কিছু বলবে বলে, কিন্তু বি ডি ও-ই বললেন, দেখুন বিভীষণবাবু, নিশ্চয় কোনও কারণ আছে যার কারণে মেয়েটি মুখ খুলছে না, কিন্তু সেই শিশুপুত্রটির তো দোষ নেই। তাকে লেখাপড়া করানোটা আমাদের কর্তব্য। আপনি ওকে ভর্তি করে নিন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার দোলাচল। কিন্তু বিভীষণ দাস তাঁর বক্তব্যে অনড়, বললেন, দেখুন ম্যাডাম। আপনি কোনও হুকুম দিলে তা মান্য করাটা আমারও কর্তব্য। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, মেয়েটি বলছে সে জানে না কার ঔরসের সন্তান। কথাটার তাৎপর্য আছে। এই সব কামিন আসলে বহুভোগ্যা। রাইসমিলে কাজ করে, বেওয়ারিস মেয়েছেলে পেয়ে সবাই তাকে ভোগ করছে--

বিদিশা ছিটকে উঠতে চায়, চোখে লাল আলো জ্বেলে বলে, তার জন্য দুলি দায়ী নয়, বাচ্চাটাও দায়ী নয়। আমাদের সমাজ দুলির মতো একটি অসহায় মেয়েকে কোনও নিরাপত্তাই দিতে পারছে না!

--কিন্তু কারও না কারও পাপ তো বাচ্চাটা? দুলি একবার বলুক না কার বাচ্চা--

বি ডি ও তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, দেখুন বিভীষণবাবু, বাচ্চা যেমন বাবার পরিচয়ে বড়ো হতে পারে, তেমনই মায়ের পরিচয়েও বড়ো হতে পারে। এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে যদি বাবার পরিচয় জানা নেই বলে একটি বাচ্চার সামনে নো এন্ট্রি বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তবে তা ঘোরতর অন্যায় হবে।

বিভীষণ দাস তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক সেন্টিমিটারও সরে আসতে চাইলেন না, দেখুন ম্যাডাম, আপনি যেমন একটি বাচ্চার জন্য ভাবছেন, আমি ভাবছি আমার স্কুলের সমস্ত বাচ্চার জন্য। যে মুহূর্তে তারা কিংবা তাদের বাবা-মায়েরা জেনে যাবে বাচ্চটার জন্মের রহস্য, অমনি তা নিয়ে প্রবল হইচই শুরু হয়ে যাবে। তখন আমার স্কুল চালানোই হবে এক ঘোর সমস্যা। আমাকে আপনি জেল দিলেও আমি ওই বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করতে পারব না।

বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পরও বিভীষণ দাস কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছোতে চাইলেন না, বললেন, ম্যাডাম, আপনি বুঝতে পারছেন না অমার স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি বরং জানার চেষ্টা করুন দুলির ছেলের বাবা কে! আজকাল তো অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে বাচ্চার বাবা কে জানার!

বি ডি ও অস্থির হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি বাচ্চাটার ডি এন এ টেস্ট করার ব্যবস্থা করছি। তা হলেই ধরা পড়বে--

বিদিশা কিছুটা হতাশ, কিছুটা আশায় দোদুল্যমান বেরিয়ে আসে চেম্বারের বাইরে। দ্রুত ফেরিনৌকো ধরে যখন স্কুলে পৌঁছোতে পারল তখন স্কুলের দ্বিতীয় ঘন্টা বাজছে। তড়িঘড়ি চক-ডাস্টার নিয়ে ক্লাসে ঢুকে হাঁপ ছাড়ে। যাক, ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পেরেছে তা হলে।

কিন্তু তার স্বস্তির মুহূর্ত বজায় থাকল না বেশিক্ষণ। ক্লাস নিয়ে টিচার্স রুমে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পৃথা পেশ করল এক হাড় হিম করা সংবাদ, বিদিশা, কোনও এক গোবিন্দবাবু তোমার খোঁজ করছিলেন হোস্টেলে এসে।

বিদিশা চমকে ওঠে, কখন?

—তুমি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই।

বিদিশা তার আতঙ্ক গোপন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না তার শরীরের কাঁপ ফুটে উঠছে তার স্বরে। বলল, কিন্তু গোবিন্দবাবু বলে তো কাউকে আমি চিনি না। কীরকম দেখতে লোকটাকে?

পৃথা যা বলল তা পায়ের নীচের পৃথিবী আরও টলে গেল বিদিশার।

--লম্বামতো চেহারা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কথা বলার সময় চশমাটা নাকের কাছে নেমে আসে। ফ্রেমের উপরে থাকে তার চোখদুটো। চেনো?

বিদিশার পা কাঁপছে। কাঁপছে তার গলার স্বর। কোনও ক্রমে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

৩২

শুধুমাত্র বিদিশা আন্টি খুশি হবে এ কারণে টিঙ্কু তার বইয়ের পৃষ্ঠায় ঝুঁকে থাকে সারাক্ষণ। অনেক রাত জেগে পড়তে শুরু করে। পরীক্ষায় ভালো করলে বিদিশা আন্টির মুখ খুশিতে ঝকঝক করবে জেনে তার পরিশ্রম বেড়ে যায়। সামনের বছর অ্যানুয়ালে আরও ভালো করতেই হবে। বিদিশা আন্টি বলেছেন হাই স্টার।

টিঙ্কু জানে তার বাবা টমাস জোন্স ক-দিন ধরেই খুব স্বস্তিতে নেই। কোন একজন চোরাশিকারির সঙ্গে তাঁর টক্কর চলছে অনেকদিন ধরে, লোকটা তার বাবাকে হুমকি দিয়েছে, 'অনেক অনেক ফরেস্টার দেখেছি। প্রথম-প্রথম অরাজি থাকলেও তারপর টাকার কাছে বশ মানে সবাই। দেখি আপনিও ক-দিন সৎ থাকতে পারেন! যদি সোজা পথে কাজ হাসিল না হয়, তবে বাঁকা পথে শায়েস্তা কবব আপনাকে!' সেদিন থেকে টিঙ্কু দেখছে তার বাবা খুব একটা শান্তিতে নেই।

তার রেজাল্টের খবরটা আরও একবার জানিয়ে টিঙ্কু বলল, হাই স্টার পেতেই হবে, বাবা।

টিঙ্কুর বাবা বলেন, তাই আমি ভাবছিলাম তোর কি মতিভ্রম হল! এত পড়ছিস!

টিঙ্কু হাসে, বলে, বিদিশা আন্টি বলেছেন সামনের বছর দারুণ রেজাল্ট হলে আমাকে একটা স্পেশাল প্রাইজ দেবেন। আর রেজাল্ট ভালো না হলে কথাই বলবেন না!

বাবা পুলকিত হয়ে বললেন, যাক, বিদিশা আন্টির ভাগ্য ভালো যে তুই তার কথা শুনেছিস। আমি এতদিন ধরে বলেও তোকে পড়তে বসাতে পারিনি।

টিঙ্কু পড়াশোনায় এতটাই জোর দিল যে পরের পরীক্ষায় দারুণ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল সবাইকে। টিঙ্কু সেকেন্ড হবে কেউ ভাবতেই পারেনি। সবাই অবাক বলল, কী রে, টিঙ্কু, তুই কতজনকে টেক্কা দিলি!

টিঙ্কু মনে মনে বলল, বিদিশা আন্টির সঙ্গে দেখা হয়ে তার পুনর্জন্ম হয়েছে। কোনও শিক্ষিকা ছাত্রীকে এত ভালোবাসলে ছাত্রীও ভালো হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

বিদিশা আন্টি তাকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুই আমার মান রেখেছিস। অনেক গার্জেনই নাকি আমার আড়ালে বলাবলি করেন তোকে নাকি আমি বেশি আহ্লাদ দিই। দ্যাখ, অ্যানুয়ালে আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারিস কি না!

টিঙ্কুর মন জুড়িয়ে যায় বিদিশা আন্টির কথায়। শরীরটা কেমন অবশ। গলা জড়িয়ে যায় কেন যেন। ফিসফিস করে বলে, চেষ্টা করব, আন্টি।

৩৩

তার জীবনের চোরাস্রোতের কথা কি শাশ্বতীদির কাছে বলবে কি বলবে না সেই ভাবনায়গত ক-দিন খুবই বিপর্যস্ত বিদিশা। হোস্টেলের বারান্দায় আনমনে পায়চারি করার ফুরসতে মুসাবিদা করছিল তার ভাবনার খসড়াটি। হঠাৎই সাড় ভাঙে পৃথার কণ্ঠস্বরে, কী এত ভাবো, বিদিশা।

শাশ্বতীদির ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে পৃথা। তার খবর নিতে বিদিশা বলল, কী করছেন শাশ্বতীদি?

—শাশ্বতীদি একা হলেই কী যেন লিখতে থাকেন আপন মনে।

—কী লেখেন?

—বিদিশা তুমি কাউকে বোলো না যেন। শাশ্বতীদি কবিতা লেখেন।

বিদিশা লাফিয়ে ওঠে, সত্যি কবিতা লেখেন? তুমি দেখেছ?

—শুধু দেখেছি তাই নয়, পড়েওছি। রীতিমতো আধুনিক কবিতা।

-তাই নাকি? খুব ইন্টারেস্টিং। তা উনি সবাইকে দেখতে দেন না কেন?

--শাশ্বতীদি তো আমাকেও বলতে চাননি। আমি একদিন ঘরে ঢুকে পড়ায় উনি চট করে খাতাটা বালিশের নীচে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ বাইরে কে ওঁকে ডাকতে আসায় উনি কথা বলতে বাইরে যেতে আমি চুপিচুপি খাতাটা টেনে নিয়ে বার করে দেখি কবিতা। তুমি সাহিত্য পড়েছ, তুমি হয়তো ভালো বুঝবে। কিন্তু আমার পড়তে খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমি ওঁকে বলিনি আমি ওঁর কবিতা পড়েছি।

—আমাকে একদিন পড়াবে ওঁর কবিতা?

--তা হলে তো একটা খাতা ঝেপে দিতে হয়। ঠিক আছে, আমি ওঁর ঘরে একটু পরেই অন্য একটা কাজে যাব। সেসময় আঁচলের নীচে দিব্যি সেঁধিয়ে নেব একটা খাতা। ওঁর র‍্যাকে অনেক খাতা আছে। একটা খাতা ঝেঁপে দিলে কিছু হবে না।

ঘন্টাখানেক পরে পৃথা সত্যিই একটা এক্সাইজ খাতা আঁচলের নীচে থেকে বার করে দিয়ে এল বিদিশাকে। বিদিশা কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে বিস্মিত হয় এই

ভেবে যে, শাশ্বতীদি এত ভালো কবিতা লেখেন, কিন্তু কারও কাছে কেন প্রকাশ করেন না নিজের প্রতিভা।

ক-দিন পরেই হঠাৎ বিদিশার সঙ্গে পথে দেখা বাংলার টিচার সৌম্য রায়ের। যথারীতি পাওনাদারের মতো সৌম্য রায় বলে উঠলেন এই যে ম্যাডাম, আমার লেখার কী হল?

বিদিশাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখায়, আপনার পত্রিকা আবার বেরোচ্ছে?

—হ্যাঁ, এই তো সামনের মাসে।

বিদিশা : দাঁড়ান, আপনার তাগিদ পেয়ে অনকগুলো কবিতা লিখে ফেলেছি। এক খাতা কবিতা। আপনাকে তার কয়েকটা কবিতা দিই।

বিদিশা তার ব্যাগ থেকে একগুচ্ছ কবিতা বার করে সৌম্য রায়ের হাতে দেয়।

সৌম্য রায় কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত, বাহ্ ভারি চমৎকার কবিতা। কিন্তু কবিতার নীচে শাশ্বতী মিত্র লেখা কেন?

—ওইটে আমার ছদ্মনাম।

—কিন্তু এই নামটা তো আপনাদের হেডমিস্ট্রেসের। কোনও অসুবিধে হবে না তো?

—কী আর অসুবিধে। ছদ্মনাম তো আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি নিতে পারি। লিখতে পারতাম বনবিবি।

—বনবিবি! বাহ, ভালো ভেবেছেন তো! সুন্দরবনের কবি বনবিবি, দারুণ খাবে পাঠক।

—খাওয়ার দরকার নেই। কবিতা তো পড়ার।

৩৪

জগু সর্দারের দল রীতিমতো দামামা বাজিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে তা দৈনন্দিন খবর পাচ্ছেন টমাস। সেদিন বেরিয়েছেন লঞ্চ নিয়ে। আজ গোটা সুন্দরবন তোলপাড় করবেন চোরাকাঠুরেদের খোঁজে। লঞ্চে উঠেই ফরেস্ট গার্ড বিশেকে বলে দিয়েছেন, বিশে আজ হেস্তনেস্ত করতে হবে কিন্তু।

—স্যার। আপনি হুকুম দিলেই পেড়ে ফেলব ব্যাটাদের।

লঞ্চ হু হু করে চিরে ফেলছে কপার সালফেটে রঙের জল। প্রপেলার পাগলের মতো ঘুরছে জলের শরীরে ঘূর্ণন তুলে। লঞ্চ পাড়ি দিচ্ছে দ্বীপময় সুন্দরবন। যখন লঞ্চের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন টমাস, নিজেকে মনে হয় রাজা-রাজা। কিন্তু তাঁর রাজত্বে থাবা বসাচ্ছে জগু সর্দারের দল!

সেদিন বি ডি ও পর্ণাসান্যালের সঙ্গে দেখা হতে একটা অদ্ভুত কথা শোনালেন, মি. জোন্স, আপনি শুনে ভিরমি খাবেন রাইসমিলের মালিক নিমেষ মিত্র এসেছিল জগু সর্দারের হয়ে তদ্বির করতে!

টমাসের কাছে খুব নতুন খবর তা নয়, তবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নিশ্চয় নিমেষ মিত্র কিছু বখরা পায় বলে আপনার মনে হয়েছে!

বি ডি ও বললেন, এদের র‍্যাকেট খুব মারাত্মক। কার সঙ্গে কার লিঙ্ক আছে বোঝা মুশকিল।

লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ডুব দিয়ে ঠিক থিতু হতে পারছিলেন না টমাস। এমন চমৎকার দৃশ্যপট পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী জঙ্গলে বাস করতে করতে আক্রান্ত হয়েছিল নিঃসঙ্গতায়। তাই একদিন তাঁকে ছেড়ে পাড়ি দিল অন্যের সঙ্গে শহরে ঘর করতে। সত্যিই তো তিনি বেশি সময় দিতে পারতেন না স্ত্রীকে।

কিন্তু তাঁর এখন মহা ভাবনা টিঙ্কুকে নিয়ে। টিঙ্কু চাপা প্রকৃতির, চটকরে বুঝতে দেয় না মা চলে যাওয়ায় তার নিঃসঙ্গতা আরও অনেক বেশি। কিন্তু কিছুকাল হল তার স্কুলের নতুন আন্টি পেয়ে দারুণ খুশিতে থাকে এখন। সারা ক্ষণ তার মুখে বিদিশা আন্টি আর বিদিশা আন্টি।

পাখির আলয় গার্লস স্কুলের নতুন আন্টিকে এখনও চোখে দেখেননি টমাস, কিন্তু তার সম্পর্কে এত কথা শুনেছেন টিঙ্কুর কাছ থেকে যে, মহিলাকে চোখে না-দেখেও তার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন তিনি। টিঙ্কুর কাছে নাকি বলেছেন সুন্দরবন এলাকা খুব ভালো লেগেছে তার। জলজঙ্গলের দেশটা এত চমৎকার দৃশ্যাবলিতে ভরা তা ভাবতেই পারেননি!

টিঙ্কুকে আরও বলেছেন, তোর বাবার কী মজা! লঞ্চ নিয়ে কত ঘুরতে পারেন জলে জঙ্গলে!

জগু সর্দারদের খোঁজে টমাস তাঁর এলাকা চুঁড়ে ফেলবেন ঠিক করেছেন, কিন্তু টিঙ্কুকে একটা রাতের জন্য কার কাছে রেখে যাবেন তা নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু টিঙ্কুই বার করেছে সমাধান।

বিদিশা আন্টিকে তার এতই ভালো লেগেছে যে, টমাস সুন্দরবনে দু-দিনের জার্নিতে যাবে শুনে সে বিদিশা আন্টিকে বলেছে একটা রাতের জন্য সে বিদিশা আন্টির কাছে থেকে যাবে। বিদিশা আন্টি সাগ্রহে বলেছেন, তা হলে তো বেশ মজাই হয়। তুই রাতে আমার কাছে থাকলে বেশ গল্প করব দু-জনে।

বিদিশা আন্টি শুধু টমাসের চাকরিটাকেই পছন্দ করেননি, তাঁর মেয়েকেও রাতে থাকতে দিয়েছেন তা ভারি বিস্মিত করছিল টমাসকে। কিন্তু সুন্দরবন যে সত্যিই

নয়নাভিরাম দৃশ্যে ভরা তার প্রকৃত রূপ এখনও তো দেখতে পারেননি বিদিশা আন্টি। দেখলে অবশ্য লাফাবেন।

সেই দৃশ্যপটের উপর চোখ পেতে টমাস এগোচ্ছিলেন তাঁর বিশাল রাজহাঁসের মতো চেহারার জলযানটিতে। গোসাবা থেকে আরও দক্ষিণ বরাবর নেমে গেলে জঙ্গলের শুরু। গোমর নদীর স্রোত ভাটার গভীর টানে ডিঙি নিয়ে যাবে সজনেখালি পার হয়ে চামটা, কেঁদো বা বড়ো হল্‌দের ঘন সবুজ রহস্যময় আখড়ায়। সুন্দরবনে পোস্টিং হওয়ার সময় এরকমটাই শুনেছিলেন কলিগদের মুখে। রাতে এই প্রথম নদীর বুকে থাকবেন টমাস। কিন্তু সারেং বলছিলেন রাতে নদীর বুকে থাকাটা নিরাপদ নয় কোনও মতে। বিশেষ সে নদী যদি জঙ্গলের ভিতর হয়। বড়ো মিঞার ভয় তো আছেই, তাছাড়া জঙ্গলের মাঝিরা কখনও হয় দুর্দান্ত, বেপরোয়া ও লুণ্ঠনবাজ। বোধহয় বনের হাজাররকম বাধাবিপত্তির মধ্যে যুঝে তারা এরকম তুখোড় ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

লঞ্চ কিছুক্ষণ জলজার্নি করার মধ্যে পৌঁছে যায় গভীর জঙ্গলে। পড়ে রইল সজ্‌নেখালির বার্ড-স্যাংচুয়ারি। বাংলায় 'পাখির আলয়' বলে খ্যাত। নদী থেকে পর পর দুটো গরানকাঠের জেটি সিঁড়ির মতো উঠে দুটো অব্‌জারভেটরির সৃষ্টি করেছে, যেখানে উঠে সমস্ত জঙ্গলটা দেখা যায় একনজরে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিনমাস এই জঙ্গলের সমস্ত পাতা ঢেকে যায় শামুকখোল, নাইট হেরন বা পানকৌড়ি পাখির ঝাঁকে। তখন সবুজ পাতার বদলে লক্ষিত হয় শাদা হিমকুচির মতো পালক। মৌসুমি পাখিরা উড়ে আসে দূর-দূরান্তর থেকে। গোসাবা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে বসে থাকে অরণ্য সাজিয়ে। গোসাপ আর চোরাশিকারির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে, কাটায়ও মোটামুটি শান্তিতে।

সজ্‌নেখালি থেকে জঙ্গল পাকাপাকি শুরু হয়ে যায়। কেবলই দুপাশে সবুজ ভেলভেটের মতো বিশ ত্রিশ ফুট উচ্চতার গরান-গেঁউয়া-হেঁতালের বন। আর তারই মাঝে কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো জঙ্গল দুভাগ করে কেটে নদী হয়ে ঢুকে পড়েছে সমুদ্রের ধারা।

গোসাবা থেকে প্রথমে সঙ্গী হল গোমর নদী, তারপর সাহচর্যে এগিয়ে এল বিদ্যাধরী। এর পর গোসাবা থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মাইলে গভীরে গোসাবা নদী পেরিয়ে এলে চামটার জঙ্গল। টাইগার-প্রকল্পের সীমানার প্রায় মধ্যস্থলে, চারদিকে কয়েকশো স্কোয়ার মাইল জুড়ে ঘন জঙ্গল আর নদীনালার কেন্দ্রে উপস্থিত চাম্‌টার ভৌগোলিক অবস্থিতি লক্ষণীয়।

কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো এইসব নদী সেঁধিয়ে গেছে জঙ্গলের গভীরে। সেই

নদীতে জোয়ার-ভাঁটার টান ও ঘূর্ণিস্রোত ছাপিয়ে আতঙ্কের বিষয় বাঘ বা কুমিরের উপস্থিতি। ঘোরাফেরার পথে যে-মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে তাদের প্রায় সবারই মুখে ফুটে উঠেছে এক বিচিত্র ভয়ের অনুভূতি। দেখা হলেই তারা ব্যক্ত করে বসে রাজকীয় বাঘের ভীতিপ্রদ কাহিনি।

এ হেন ভৌগলিক পরিবেশে সুন্দরবনের সব জঙ্গলেই কাহিনিগুলি প্রায় অনেকটা একই ধাঁচের। কখনও জঙ্গলে সেঁধুতে থাকা কাঠুরের দঙ্গলের একজন উধাও হয় বাঘের পিঠে-যে বাঘের অস্তিত্ব তারা অনুভব করতে পারেনি এক মুহূর্ত আগেও। আবার গাছের পিঠোপিঠি বসে জিরোতে থাকা একজনের হদিশ মেলে না অন্যের অজান্তে, হঠাৎ করেই। এমনকি মাঝনদীতে ঘুমন্ত মাঝিমাল্লাদের একজনকে গভীর রাতে ঘাড় মুচড়ে পিঠে ফেলে ফের সাঁতার কেটে জঙ্গলে ফিরে যায় এই বিভীষিকারা।

দু-দিনের এই জলজার্নিতে জগু সর্দারের খোঁজ পাননি টমাস, কিন্তু তাঁর ঝাঁপিতে তুলে নিয়ে এলেন অনেক অজানা অভিজ্ঞতা, অনেক অচেনা গল্প।

৩৫

একদিন অনেক রাতে, ঝিঁঝিদের মিটিং শুরু হওয়ার ঠিক পরেই বেজে ওঠে বিদিশার মোবাইল, সুইচ অন করতেই, কে, বুম্বা? বল্ কেমন আছিস তোরা? কী বললি? নক্ষত্রকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ!

পরদিন স্কুলে যেতে টিঙ্কুর হঠাৎ বায়না, আন্টি, একদিন আমাদের বাড়ি যাবেন?

বিদিশা টিঙ্কুকে টেনে নেন বুকের মধ্যে, কেন রে, তোদের বাড়ি যেতে হবে কেন?

—আসলে কী জানেন, আন্টি। আমি রোজ গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এটা ওটা বলি। কত প্রশংসা করি। বাবা যত শোনে, তত বলে, ও বাবা, তুই যে আমাব চেয়েও আন্টিকে বেশি ভালাবেসে ফেলেছিস! তোর আন্টির সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হচ্ছে যে!

—তোদের বাড়ি কে কে থাকেন?

--কেউ তো না। শুধু আমি আর বাবা। যাবেন, আন্টি?

বিদিশা অন্যমনস্ক হয়, ঠিক আছে, তাড়ার কী আছে। কোনও একদিন না একদিন নিশ্চয় যাব।

বিজিতপুরে প্রতিটি দিন কেমন উদভ্রান্তির মধ্যে কেটে যাচ্ছে বিদিশার। নিশ্চিন্তপুরের দিনগুলো তার নিশ্চিন্তির মধ্যে কাটে না। সারাক্ষণ এলোমেলো ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাবনা। সেদিনই স্কুল থেকে ফেরার

পথে পৃথার সঙ্গে যাচ্ছে, হঠাৎই একটা মোটরবাইক তার গা ঘেঁষে বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল। আর একটু হলেই--

বিদিশা ছিটকে সরে এসে পৃথাকে বলল, পৃথা, আর একটু হলেই বোধহয় ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক অভিমুখে যাত্রা শুরু করতাম।

--কী সাংঘাতিক গতিতে বেরিয়ে গেল বাইকটা!

—মোটরবাইকগুলো যে স্পিডে রাস্তা দিয়ে যায় তার একঝলক ছোঁয়া গায়ে লাগলেই আর দেখতে হবে না।

—কে ছিল বাইকে বোঝা গেল না!

--ছেলেটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখে কালো চশমা। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

—নিশ্চয় এ হল মন্ত্রী।

—মন্ত্রী মানে?

—রাজার এক নম্বর সাগরেদ। আসল নাম মন্টু। রাজা যত দুষ্কর্ম করে, এ হল তার প্রধান মন্ত্রণাদাতা। বিদিশা, একটু সাবধানে থেকো। রাজা মন্ত্রী সবাই কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস।

বিদিশা হঠাৎ হেসে উঠল, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, এখন আর কোনও কিছুতেই বোধহয় ভয় পাওয়ার নেই।

বিদিশা একটা বিপদ কাটিয়ে উঠল তো বিপদ এল পৃথার ঘরে।

বাড়ি ফিরে সদ্য গা ধুয়ে পাটভাঙা শাড়ি পরে ডায়েরিটা নিয়ে বসেছে অমনি শুনতে পেল পৃথা একা বসে কাঁদছে তার ঘরে।

বিদিশা ডায়েরি ফেলে বেরিয়ে এল পৃথার ঘরে, কী হয়েছে, পৃথা?

পৃথার পাশে মোবাইল ফোনটা শুয়ে অছে নিরীহ মুখে।

--কী হয়েছে, পৃথা? বাড়ির কোনও খবর পেয়েছ?

পাশে বসে ঐশীদি, বললেন, পৃথার বাবার খুব বাড়াবাড়ি।

বিদিশা পৃথার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, বলে, এ সব অসুখ মাঝেমধ্যে বাড়াবড়ি হয়, আবার ডাক্তারের ওষুধ পড়লে ঠিক হয়ে যায়। তুমি কলকাতায় যাবে?

পৃথা চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, আমার আর ছুটি নেই। মীনা ফোন করেছিল। ও-ই নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে। গত দু-বছরে কতবার কলকাতায় ছুটতে হল আমাকে। হাসপাতাল আর বাড়ি। হাসপাতাল আর বাড়ি। কলকাতার হাসপাতালগুলো আমার আর মীনার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে।

বিদিশা পৃথার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, বলে, তুমি কী করবে? তুমি তো জানো এ অসুখের পরিণতি কী।

৩৬

গোবিন্দ গোস্বামী নামের একজন ঢ্যাঙা মতো লোক বিদিশার খোঁজ করছে এখানে ওখানে তা ঘুরে ফিরে কানে আসে, কিন্তু লোকটিকে এখনও পর্যন্ত দেখেনি বিদিশা। আজকাল বাইরে একা ঘোরাফেরা করতেও ভয় পায়। স্কুলে যাওয়া-আসা করে পৃথার সঙ্গে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি দেখা হয়ে যাবে নক্ষত্রের সঙ্গে, দেখা হলে নক্ষত্র কী বলবে, কীভাবে তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে তা যেমন তার আতঙ্কের বিষয়, তেমনই পৃথা বা অন্যেরা কীভাবে গ্রহণ করবে তার জীবনের এই অনালোকিত দিকটি জেনে ফেললে তাও তার দুর্ভাবনার কারণ।

এই টানাপোড়েনের মধ্যে তার একদিন দেখা হয়ে গেল গ্রামপ্রধান জনার্দনবাবুর সঙ্গে। তেমন ব্যক্তিত্ব নেই লোকটির, কিন্তু নিজে থেকেই বললেন, এই যে ম্যাডাম, সেদিন বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম মিটিংয়ে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন দুলির ছেলেটা ভর্তি হতে পেরেছে কি না।

—তা আপনি কী বললেন?

—বললাম মাস্টারমশাইরা কেউ নিতে চাইছেন না। সবাই বলছে বাবার নাম না লিখলে পরে সমস্যা হবে। এটা গাঁ-দেশ তো!

বিদিশা চুপ করে থাকে।

—তা বিডিও কী বললেন জানেন? বললেন তা হলে ছেলেটির ডি এন এ টেস্ট করানো হবে। তা হলে কালপ্রিট খুঁজে বার করতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বেশি দেরি হবে না। বেশ হুমকি দিয়েই কথাটা বললেন।

--হুমকি তো দেওয়াই উচিত। একটা অন্যায় চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে আর আমরা সবাই চোখ বুজে থাকব তা কী করে হয়?

--কিন্তু মা-জননী, এটা গাঁ-দেশ। এ নিয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করলে কী থেকে কী হবে তা আপনি জানেন না।

বিদিশার মুখ রাগে গনগনে হয়ে ওঠে, বলে, জনার্দনবাবু, লোকে অনেকে অনেক কিছু বলে বা বলবে, কিন্তু একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির উচিত সেই জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। না করতে পারলে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধির তফাত রইল কোথায়?

গ্রাম প্রধান আমতা আমতা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁকেও যেন অসহায় দেখায় এ বিষয়ে। বিদিশা বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে যায় তার গন্তব্যে। একের পর এক জায়গা থেকে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসছে বিদিশা, ততই তার ভিতরে উথলে উঠছে হতাশা। সেদিন বিকেলে হোস্টেলের ঘরে বসে আছে গা এলিয়ে, হঠাৎ

মোবাইলে ফোন আসে বিদিশার। বুম্বার ফোন : দিদি, নক্ষত্রদা কিন্তু তোর সন্ধান পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

বিদিশা এরকমই আশঙ্কা করেছিল, তার শরীরে বইতে শুরু করেদিল সেই ভয়ংকর অ্যাড্রেনালিন। বলল, কী করে জানলি?

—হঠাৎ সেদিন আমাদের বাড়ি এসে বলেছে বিদিশার মোবাইল নম্বর দিন। ঠিকানা দিন।

—তুই কী বললি?

—বলেছি দিদির ঠিকানা আমরা জানি না। মাঝে মাঝে ফোন করে ঠিকই, কিন্তু কাউকে বলেনি কোথায় গেছে। দিদি, খুব সাবধানে থাকিস। নক্ষত্রদা আরও ডেঞ্জারাস হয়ে গেছে জেল খেটে বেরিয়ে।

বিদিশার বুক কাঁপতে থাকে। বলল, কিন্তু তুই কী করে বুঝলি আমার ঠিকানা পেয়ে গেছে?

—বলল, ঠিক আছে আপনারা না দেন আমি ঠিক জোগাড় করে নেব। দরকার হলে এস এস সি-র অফিসে গিয়ে ঠিকানা নিয়ে আসব। ও কি ভেবেছে আমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে? আমি দেখে নেব ওকে। তারপর থেকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো তোদের ওখানই গেছে।

বিদিশার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে দ্রুত। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ঘন্টাধ্বনির শব্দ শুনতে পায় হৃৎপিণ্ডের গভীরে কোথাও। একবার ভাবল হোস্টেলের সবাইকে বলে তার দুর্ভাগ্যের কথা। বিষয়টা এতদিন সবাইকার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু—

সারাদিনমান সেই আতঙ্ক ফিরে আসতে থাকে যা তাকে আবর্তিত করত কলকাতায়। রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, কিন্তু চোখে ঘুম নামে না। নক্ষত্রর হাসি-হাসি মুখে বীভৎস চাউনি মাখিয়ে তাড়া করে ফেরে গোটা রাত। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল মেঝে ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াবে নক্ষত্র। বা চাল ফুঁড়ে নেমে আসবে নক্ষত্র। কিংবা—

বিদিশার জীবনে কেটে গেল আরও একটি বিক্ষুব্ধ ঝড়ঝাপটের রাত।

পরদিন সকালে তখনও সে টাটকা হয়ে উঠতে পারেনি তার আগেই রসমতী এসে বলল, বিদিশা দিদিমণি, কে যেন ডাকতিছে আপনাকে। ভদ্দরলোকের মতো চ্যায়রা।

বিদিশার শরীরে ভুঁইকাঁপ, কোনও সন্দেহ থাকে না নক্ষত্রই ঠিক খুঁজে খুঁজে এসেছে তার কাছে। এখন সে কী করবে কী করা উচিত তা ভেবে প্রবল উৎকণ্ঠিত। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল আজই একটা হেস্তনেস্ত করে নেবে এ বিষয়ে।

গনগনে আঁচ হয়ে উশকোখুশকো বেরোল ঘর থেকে। এটা বিজিতপুর, এখন তার কর্মস্থল, এখানে নক্ষত্রর কোনও পাগলামি বরদাস্ত করবে না, দরকার হলে পুলিশে খবর দিয়ে তাকে আবারও গ্রেফতার করাবে। কিন্তু ভিজিটিং রুমে গিয়ে দেখল হাসি-হাসিমুখে বসে আছেন বয়েজ হাই স্কুলের শিক্ষক সৌম্য রায়।

বিদিশার শরীরে স্বস্তির প্রবাহ, আ রে আপনি?

সৌম্য রায় সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায় গার্লস স্কুলের মিস্ট্রেসকে।

--জানেন, আপনার কবিতাগুলো এত হাই স্ট্যান্ডার্ডের! ওগুলো শিগগির বেরিয়ে যাবে 'প্রাজ্ঞ'য়।

বিদিশার মনে পড়ল সৌম্য রায়ের পত্রিকার কথা। সেদিন হোস্টেলে ফেরার পর উল্টেপাল্টে দেখেছিল লিটল ম্যাগাজিনটি। সৌম্য রায় নিজেই অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন, বেশ ভালোই লাগছিল পড়তে। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে যা খুবই উচ্চমানের। সে-কথাই জানিয়ে বলল, জানেন, সুন্দরবনের দেবতা বাবা দক্ষিণরায়ের উপর একটি প্রবন্ধ আছে না, সেটি ভারি ইন্টারেস্টিং। লেখকের নাম ভারি অদ্ভুত– সাহিত্যিক গুপ্ত।

সৌম্য রায় মুখে পূর্ণিমার চাঁদ এঁকে বলল, ওটা আসলে আমারই ছদ্মনাম।

বিদিশা হেসে উঠে বলল, আমি বুঝতেই পেরেছিলাম ওটা কারও ছদ্মনাম। কিন্তু আপনারই লেখা তা বুঝতে পারিনি।

—কী করব বলুন? এই বিজিতপুরে এত লেখা কোথায় পাব বলুন? তাই নিজেই সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে স্বনামে বেনামে কবিতা, প্রবন্ধ সব লিখতে হয়। আমি তো ঘুরে ঘুরে এখানকার অনেককেই লেখক বা কবি বানাতে চেষ্টা করছি। যেমন আপনাকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি এই সংখ্যায়।

বিদিশার ভিতরে অস্বস্তির স্রোত, বলল, দেখুন, সৌম্যবাবু, এই কবিতাগুলো কিন্তু –

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সৌম্য রায় বললেন, মিস সেন, আমি কিন্তু এবার আপনার কাছ থেকে একটা ছোটোগল্প প্রার্থনা করছি সামনে সংখ্যার জন্য।

বিদিশা চোখে অমাবস্যা দেখে, আমি লিখব ছোটোগল্প? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—না না । কী যে বলেন? আমার মাথা একশো ভাগ ভালো। লেখক বা কবি তো এভাবেই তৈরি করতে হয়। শুনেছি আপনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা গদ্য লেখেন ডায়েরিতে। সবই নিশ্চয় আপনার অভিজ্ঞতা। ইচ্ছে করলে আপনি সামনের সংখ্যায় একটি ছোটো উপন্যাস বা নভেলেট লিখতে পারেন।

—না, সৌম্যবাবু, এই জলজঙ্গলের দেশে পড়ে থেকে আপনার মাথাটা গেছে। উপন্যাস লেখা অত সহজ নাকি?

—আমি আপনাকে টিপস দিচ্ছি। ধরুন, আপনার জীবনে নানা ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সংকটের ঘটনাটা বেছে নিন। এবার সেই অভিজ্ঞতা টুকরো টুকরো করে লিখতে থাকুন ডায়েরিতে। মাসখানেক লেখার পর এবার কয়েকদিন ফেলে রাখুন। তারপর পাঠক হিসেবে পড়তে থাকুন লেখাগুলো। দেখবেন আপনার অজান্তেই লেখাগুলো একটা কাহিনির রূপ নিয়েছে। তারপর শুধু সাজিয়ে ফেলা।

বিদিশা হেসে উঠে বলল, ব্যস? উপন্যাস হয়ে গেল?

—না। আরও আছে। লেখাটার মধ্যে এরপর প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। ঠিক যেমন দেবীমূর্তি গড়ার পর তাতে চক্ষুদান করতে হয়।

বিদিশা হাসতে থাকে, কীরকম?

—লেখার মধ্যে কিছু সংলাপ লিখতে হবে। তখন আপনার লেখা অভিজ্ঞতার চরিত্রগুলির সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে হবে আপনাকে। যেমন আপনার সঙ্গে আমার এই কথোপকথন, এগুলোও তো কোনও উপন্যাসের সংলাপ হতে পারে?

বিদিশার হাসি আর থামে না, বলে, সংলাপ না হয়ে প্রলাপও তো হতে পারে?

—প্রলাপও তো এক ধরনের সংলাপ। প্রলাপ বলুন, বিলাপ বলুন, দূরালাপ বলুন, স্বগত ভাষণ বলুন, সবই এক-এক ধরনের সংলাপ। যখন যেমন প্রয়োজন, লেখক সংযোজন করে দেন।

বিদিশার শুনতে ভালোই লাগছিল সৌম্য রায়ের প্রলাপগুচ্ছ। বলল, তারপর?

সৌম্য রায় ভারি উৎসাহিত হন একজন বাধ্য ছাত্রী সামনে পেয়ে, বললেন, তারপর নিজে আর একবার পড়বেন লেখাটা। দেখবেন কাহিনিটা যেন শুধু মাত্র আপনার কাহিনি না হয়।

বিদিশার হাসি থামে, তবে কার কাহিনি হবে?

—তাবৎ পৃথিবীর মানুষের কাহিনি। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা-প্রেম- বিরহ সবই একই খাতে প্রবাহিত হয়।পাঠকও যেন একাত্ম হয়ে ভাবতে পারে এ কাহিনি তার জীবনের কাহিনিও বটে।

বিদিশা এতক্ষণে হাসি থামিয়ে সিরিয়াস হয়, দেখুন সৌম্যবাবু, উপন্যাস বা ছোটোগল্প কোনওটাই লেখা অত সহজ নয়। তা হলে পৃথিবীর সবাই ঔপন্যাসিক বা ছোটোগল্পকার হতে পারত।

সৌম্য রায় রণে ভঙ্গ দেওয়ার কোনও লক্ষণ দেখালেন না, বললেন, সহজ নয় তা আমি জানি। কিন্তু সব মহৎ কর্মেরই কোথাও তো একটা শুরু থাকে। ধরুন আজ থেকে আপনার সেই কাজের শুরু। আপনি নিজেকে খনন করুন। দেখবেন আপনার জীবনে নানা সংকট ঘনিয়ে এসেছে বারবার। সেই সংকট থেকে আপনি

চেষ্টা করেছেন বেরোতে। খুব সহজ কাজ তা নয়। সেই টানাপোড়েন আপনি লিখতে থাকুন ডায়েরিতে। প্রতিদিন যাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে লড়াই করুন। সেই লড়াইয়ের কাহিনিই হয়ে উঠতে পারে একটি উপন্যাস।

বিদিশা থম হয়ে শুনতে থাকে সৌম্য রায়ের কথাগুলো, তিনি তখনও বলে চলেছেন, মেয়েদের জীবনে এক-একটি পর্বে এক-এক ধরনের সংকট আসে। তারা সেই সংকটের মুহূর্তগুলো অনেক বেশি অনুভব করতে পারে, তার সঙ্গে যুঝতেও পারে। আপনি লিখুন না সেই কাহিনি। দেখবেন পাঠক চমকে যাবে। আবিষ্কার করবে এক নতুন লেখক।

হঠাৎ হোস্টেলের ভিতর থেকে রসমতী বেরিয়ে আসে ভিজিটিং রুমে, বলে, বড়দি ডাকতিছে।

সৌম্য রায় বোধহয় এক আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে ছিলেন, সাড় ভেঙে ও বিদিশারও সাড় ভাঙিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি আসছি।

সৌম্য রায় বেরিয়ে যাওয়ার পর বিদিশার খেয়াল হল তার বলা উচিত ছিল শাশ্বতী মিত্র নামের যে লেখা তাঁকে দিয়েছিল সেটি আসলে বিদিশা সেনের লেখা নয়। তাদের বড়দি শাশ্বতী মিত্রেরই। কিন্তু বলার সুযোগ পাওয়া গেল না।

হোস্টেলের ঘরে ফিরে আসার পর শাশ্বতীদি জিজ্ঞাসা করলেন,কী বলছিলেন বয়েজ স্কুলের বাংলার টিচার? ভদ্রালোকের নাকি লেখার বাতিক আছে?

বিদিশা হেসে বলল, শুধু কি সৌম্য রায়েরই লেখার বাতিক, শাশ্বতীদি? আমারও যেমন চিঠি লেখার বাতিক, তেমনই আপনারও তো কিছু লেখার বাতিক আছে।

শাশ্বতীদি সামান্য লাজুক হাসি হাসলেন।

৩৭

টিঙ্কু স্কুল কম্পাউন্ডে পা দিয়েই দেখল বিদিশা আন্টি লনের ফুলগাছের পরিচর্যা করছেন এক মনে। তাকে খেয়ালই করতে পারছেন না তখন। শীত ঝাঁপিয়ে পড়েছে সুন্দরবনে। বিদিশা আন্টির সবুজ ফুলফুল শাড়ির উপর একটা লাল কার্ডিগান। তাতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। একটা রজনিগন্ধার ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে বাঁধছেন ঝাড়টিকে। ফুলন্ত রজনিগন্ধার ঝাড়টিকে তাতে আরও ঘন দেখাচ্ছে আজ।

তাকে অমনি সাহায্য করতে শুরু করে টিঙ্কু।

বিদিশা আন্টি সোজা হয়ে তাকালেন তার দিকে, দেখি, কীরকম চুল আঁচড়েছিস আজ?

টিঙ্কুর মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, না, ঠিক হয়নি। চল। তোর চুলটা ঠিক করে আঁচড়ে দি। এত বড়ো হলি, এখনও ঠিকমেতো চুল আঁচড়াতে শিখলি না!

টিঙ্কু হাসে, সে আজকাল মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করেই ভালো করে চুল আঁচড়ায় না, তাতে বিদিশা আন্টি তাকে বকা দেবেন, তারপর নিজের হাতে তার চুল আঁচড়ে দেবেন তাতে টিঙ্কুর কী যে শান্তি!

টিঙ্কু : জানেন, আন্টি, বাবা বলছে আমি নাকি হঠাৎ খুব ভালো মেয়ে হয়ে গেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আগে খুব জ্বালাতাম তো বাবাকে। খুব জেদ-বায়না করতাম তো।

—যাক, তা হলে তোমার বাবা এখন খুব খুশি তো?

—খুব খুশি। রোজই বলেন তোদের বিদিশা আন্টিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। এরকম মিরাক্‌ল যিনি করতে পারেন!

—এর মধ্যে কোনও মিরাক্‌ল নেই।

টিঙ্কু হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলায়, জানো, আন্টি, বাবা ক-দিন ধরে খুব মন খারাপ করে আছে।

বিদিশা অন্টিকে খুব উদ্বিগ্ন দেখায়, কেন রে?

—কাঠচোরদের একটা গ্যাং কাজ করছে বাবার এলাকায়। বাবা তাদের অনেক নৌকো ধরেছে। মালগুলো বাজেয়াপ্ত করার জন্য পুলিশকে বলেছে। কিন্তু তারা এখন বাবার উপর চাপ সৃষ্টি করছে নৌকোগুলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বাবা কিছুতেই ছাড়বে না। তাই নিয়ে খুব ঝামেলা।

—কী ঝামেলা? বিদিশা আন্টির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

—তারা বাবাকে শাসাচ্ছে নানাভাবে। বাবা বলেছে কিছুতেই ছাড়বে না মাল। লোকগুলো পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের ধরতে পারলেই চালান করে দেবে কোর্টে।

—তুই এত কথা কী করে জানলি?

—বাবার মন খারাপ হলে আমি বাবার পাশে বসি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। জানতে চাই কী হয়েছে? বাবার তো কোনও বন্ধু নেই। আমিই বাবার বন্ধু, বাবার গার্জেন সব।

—তাই নাকি? বিদিশা আন্টি হাসতে থাকেন, তা বেশ তো।

টিঙ্কুর হঠাৎ কী মনে পড়ে যায়, বলে, আন্টি, জানো বাবার একজন অদ্ভুত ধরনের বন্ধু হয়েছে।

--তাই নাকি?

--হ্যাঁ, লোকটা কলকাতা থেকে এসেছে।

--কী জন্য এসেছে? বিদিশার বুকের ভিতর সেই হিমকাঁপ।

--আপনাদের হোস্টেলে গিয়েছিল কী কারণে যেন। কাউকে খুঁজছিল, খুঁজে না-পেয়ে রাস্তায় ঘুরছিল একা-একা। তখন বাবা তাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে।

--তারপর? বিদিশার গলা কাঁপতে থাকে।

--বাবা তার কাছে সব শুনে বলেছে আপনি গার্লস স্কুলের হোস্টেলে যাবেন না। ওদের হোস্টেলে একটা মস্ত আলসেশিয়ান আছে। অচেনা লোক দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খায়।

--তারপর?

--শুনে লোকটা বলেছে, ঠিক আছে যাব না।

--তারপর?

--লোকটার তো এখানে কোনও থাকার জায়গা নেই। নদীর ঘাটে এই ঠাণ্ডায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকত। বাবা তাই বলেছে বাবাদের বিট অফিসের একটা ফাঁকা ঘরে থাকতে। কিন্তু বাবা বারবার বলছে কলকাতায় ফিরে যান। এখানে বাইরের লোক থাকা ঠিক নয়। পুলিশ অচেনা মানুষ দেখলে ধরছে। পুলিশের নাম শুনে লোকটা ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু লোকটা এখান থেকে যাচ্ছে না। কীরকম হি হি করে হাসে, আর চশমার উপর দিয়ে তাকায়।

বিদিশা আন্টি হঠাৎ কীরকম অস্থির-অস্থির করতে থাকেন। টিঙ্কু খেয়াল করে দেখে বিদিশা আন্টির মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে, আপনি ওকে চেনেন নাকি? লোকটা কেমন পাগল-পাগল। বাবাকে বলেছে আপনার খুব ঝামলা যাচ্ছে, তাই না? আমি আপনাকে হেল্প করব।

তাদের দু-জনের কথার মাঝখানে টিঙ্কুদের বড়দি এসে দাঁড়ান সেখানে, বাহ্, বিদিশা, তোমার হাতের পরিচর্যায় কেমন ফুল ধরেছে বাগানে!

৩৮

সকালে উঠেই নদীর বুক ছুঁয়ে ভেসে আসা এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া উপহার পেতেও বিদিশার মুখে হাসি নেই। কলকাতায় যেমন ম্রিয়মান থাকত তেমনই বিষণ্ণ, আনমনা দেখায় তাকে। তার মুখ দেখলেই যে কেউ ধরে ফেলবে সে দারুণ চাপের মধ্যে আছে। আজকাল সে একেবারেই একা পথ চলতে সাহস পায় না। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় নক্ষত্র তার সামনে হঠাৎ উদিত হয়ে বলবে, 'বিদিশা, আই

লাভ ইউ।' হয়তো সবার সামনেই তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে, আদর করতে চাইবে। সে যে কী সাংঘাতিক এক দৃশ্যের অবতারণা ঘটবে তা ভাবতে শিউরে ওঠে বিদিশা।

অথচ তার এখনই একবার বি ডি ও অফিসে যাওয়ার দরকার। তার এত প্রয়াস সত্ত্বেও দুলির ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না এ তার পরাজয়ই। পৃথাকে জিজ্ঞাসা করল, পৃথা, একবার আমার সঙ্গে যাবে?

সব শুনে পৃথা রাজি হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। পৃথা তার ভালো বন্ধু। তার সমস্যার সঙ্গে একাত্ম বোধ করে, তাকে সাহায্য করতে কোনও দ্বিধা বোধ করে না। পৃথাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সকাল-সকাল। নদী পার হয়ে বিডিও অফিসে যায়। বি ডি ও-র চেম্বারে মুখ বাড়িয়ে দেখে তাঁর চেয়ার খাঁ খাঁ।

একজন আর্দালি বসেছিল একটা টুলে, তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, বি ডি ও নেই?

—না, ট্যুরে গেছেন।

—ট্যুরে? সে কত দূরে?

—কী জানি! তবে এখুনি এসে পড়বেনখন।

বি ডি ও-র চেম্বারের বাইরে একটা লম্বা বেঞ্চি আছে সেখানেই দু-জনে বসে। চারপাশে আরও কত মানুষ কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে অপেক্ষা করছে বি ডি ও-র জন্য।

অপেক্ষার মধ্যেই হঠাৎ পৃথা বিদিশার কানে ফিসফিস করে, বিদিশা, রঘু এখানে কেন?

—রঘু কে?

পৃথার চোখ অনুসরণ করে বিদিশা দেখতে পায় একজন বেঁটে, মোটাধরনের লোক তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক। পৃথা ফিসফিসায়, সেক্রেটারির লোক।

বিদিশার ভুরুতে ঘনিয়ে আসে মেঘ, এখানে কেন এসেছে?

—তা তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের অনুসরণ করেই এসেছে এখানে। ফেরিনৌকোয় ওকে দেখেছিলাম উঠতে। তারপর এখানে আসার পর থেকেও দেখছি চুপচাপ দাঁড়িয়ে নজর রাখছে আমাদের দিকে।

—ভারি অদ্ভুত তো! আমরা ব্যক্তিগত কোনও কাজে বাইরে আসতে পারব না?

—বিদিশা নিমেষ মিত্র লোকটা কী ডেঞ্জারাস ভাবতে পারবে না! ছন্দিতাকে যা প্যাঁচে ফেলেছে ভাবতে পারবে না। এখন ছন্দিতার বেরিয়ে আসার কোনও উপায় নেই।

--নেই কেন? বিদিশার চোখ জ্বলে ওঠে দপ করে, আমাকেও তো টার্গেট করেছিল। কতবার ডেকে পাঠিয়েছিল ওর বাড়িতে। আমি তো যাইইনি, উপরন্তু প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দিয়েছি।

--তাই নাকি? পৃথার চোখে কৌতূহল।

--প্রথমেই এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি যে আমাকে আর ঘাঁটাতে সাহস করছে না। কিন্তু ছন্দিতাই বা বেরিয়ে আসতে পারছে না কেন?

--শুনেছি নিমেষ মিত্র এমন কিছু ছবি তুলে রেখেছে অটোমেটিক ক্যামেরা দিয়ে যা রীতিমতো অশ্লীল। ছন্দিতাকে সেই ছবি দেখিয়ে শাসিয়েছে বেগোড়বাই করলেই লোকাল কাগজে ছাপিয়ে দেবে। উপরন্তু এও টোপ দিয়েছে নিমেষ মিত্রর উপপত্নী হয়ে থাকতে পারলে কালে কালে তাকেই এই স্কুলের আসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস করে দেবে।

বিদিশা চমকে উঠে বলল, বলো কী?

–হ্যাঁ। ছন্দিতা এমন ফেঁসেছে যে তার আর কোনও উপাযই নেই জাল কেটে বেরিয়ে আসার। বরং এখন সে-ই নিমেষ মিত্রর স্পাই হিসেবে কাজ করছে। আমরা কেউই ওর সামনে স্কুল নিয়ে কোনও কথা বলি না। অনেক সময় আলোচনার কিছু না-পেলে আবহাওয়া নিয়ে গল্প করি।

তাদের কথার মধ্যে হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল বি ডি ও-র গাড়ি। ড্রাইভার ব্রেক কষতেই সাদা অ্যাম্বাসাডারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পর্ণা সান্যাল। বিদিশাদের অপেক্ষা করতে দেখে দাঁড়িয়ে হাসলেন এক ঝলক, কী ব্যাপার, আপনারা? আসুন ভিতরে।

পর্ণার পিছু পিছু ওরা দুজন ঢুকে পড়ে বি ডি ও-র চেম্বারে। তাদের হাতে খুব বেশি সময়নেই, বিদিশা পৃথা সঙ্গে পর্ণার আলাপ করে দিয়ে বলে, দুলির ছেলেকে ভর্তি করার বিষয়ে কিছু একটা করতেই হবে আপনাকে। বিজিতপুরের সবাই বিষয়টা নিয়ে বেশ হাসিঠাট্টা করছে আজকাল।

পর্ণা: হ্যাঁ, সেদিন এস ডি ও-র আলোচনা করছিলাম। উনি বলছিলেন তা হলে বাচ্চাটাকে কোনও হোমে পাঠিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না তার খোঁজ নেবেন।

বিদিশা হাঁপ ছেড়ে বলে, তা হলে তো ভালোই হয়। এখন তো দেখা যাচ্ছে বাবা-মা থাকতেও বাচ্চাটা সমাজের চোখে অনাথ। এভাবেও যদি লেখাপড়ার শেখার সুযোগ পায় তাই হোক। কিন্তু আপনি বলেছিলেন না বাচ্চাটার ডি এন এ টেস্ট করাবেন। তাতে কিন্তু কেউ-কেউ ভয় পেয়ে গিয়েছে।

--কেউ কেউ মানে?

—মানে অনেকেই আমাকে বলছে এ বিষয়ে যেন অমি আর না এগোই। কিন্তু আমারও জেদ কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

বি ডি ও আশ্বাস দিলেন, দেখা যাক কী করতে পারি। আপনারা বাচ্চার মায়ের সঙ্গে কথা বলুন। হোমে দিতে গেলে গার্জেনের অনুমতি লাগে। দুলি রাজি হলে তবেই—

বি ডি ও-র চেম্বারের বাইরে বেরোতেই তারা দেখল রঘু নামের সেই লোকটি এতক্ষণ পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কী কারণে যেন। তাদের দেখেই বেরোতেই পোঁ পোঁ করে হেঁটে চোখের নিমেষে হাওয়া।

পৃথা বলল, বলেছিলাম না লোকটা নিমেষ মিত্রর স্পাই।

বিদিশার পায়ে প্রায় শিকড় , বলল, কী সাংঘাতিক! আমরা কোথায় যাই না-যাই, কার সঙ্গে দেখা করি না-করি, কাকে কী বলি না-বলি তাও নজরে রাখবে লোকটা!

পৃথার মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভয় পেয়েছে ব্যাপারটায়। বিদিশা অবশ্য তাকে সাহস দেয়, পৃথা, মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীটা এত সুন্দর। কিন্তু কিছু কিছু খারাপ লোকের উপস্থিতিতে পঙ্কিল হয়ে ওঠে জীবনটা! অনেক সময় বেঁচে থাকাটাও হয়ে ওঠে বিপজ্জনক!

দুজনে আবার নদী পেরিয়ে ফিরে আসে বিজিতপুরে। শাশ্বতীদিকে কিন্তু মোটেই প্রীত দেখাল না তাদের দুজনের এই অ্যাডভেঞ্চারে। বললেন, এদের তুমি এখনও চেনোনি. বিদিশা। হয়তো কারও একটা এমন ক্ষতি করে দেবে তখন আর আপসোসের সীমা থাকবে না।

বিদিশা কিছুক্ষণ থম হয়ে থেকে বলল, বি ডি ও বললেন বিল্লুকে কোনও হোমে রেখে পড়াবেন। এখন দুলি যদি রাজি হয় তবেই। আমি দেখি দুলির সঙ্গে কথা বলে।

বিদিশা সেদিনই প্রসঙ্গটা তুলল রসমতী আর দুলির কাছে। বলল, দ্যাখো, দুলি, এখাকার কেউই কিন্তু রাজি হচ্ছে না বিল্লুকে ভর্তি করতে। বরং বিল্লু কোনও হোমে ভর্তি হতে পারলে ভালো লেখাপড়া শিখতে পারবে।

দুলি কিন্তু শুনেই মাথা ঝাঁকায়, না দিদিমণি, বিল্লুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

বিদিশা অনেক বোঝায়। তার ছেলে লেখাপড়া শিখে মস্ত চাকরি করবে। কিন্তু দুলি অনড়। বলে, এখানকার স্কুলে কেন পড়তে দেবে না ওরা?

বিদিশা হঠাৎ খেপে যায়, তুমিও তো বাচ্চার বাবার নাম বলতে চাইছ না।

দুলি হাউমাউ করে কেঁদে বলে, ওর বাবার নাম বললে আমাকে কুপিয়ে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে বলেছে।

৩৯

পরীক্ষা যত এগিয়ে আসে তার মন খারাপ হয়ে যায় টিঙ্কুর। তার পড়ায় মন বসে না। পড়ার বইয়ের দিকে চোখ পাতে, কালো কালো অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট হয় অন্য কোনও ভাবনায়। জিজ্ঞাসা করে, বাবা, সত্যি সত্যি কি তোমাকে ওরা বদলি করে দেবে বলছে?

--হ্যাঁ, তাই তো শাসাচ্ছে । আমি ওদের খাবারের প্লেটে হাত দিয়েছি কি না!

--বাবা, তুমি ওদের খাবারের প্লেট থেকে হাত তুলে নিতে পারো না?

--কেন রে? কেউ যদি একের পর এক অন্যায় কাজ করতে থাকে তা হলে তার প্রতিবাদ তো করতেই হবে! না করলে তো সুন্দরবন একদিন ফাঁকা চর হয়ে যাবে নিশ্চিত। সুন্দরবনে গাছ বলতে থাকবে না। অসুন্দরবন হয়ে যাবে।

টিঙ্কুর চোখ ছলছল করতে থাকে, তা হলে আমার কী হবে?

—কী আর হবে! তুই নতুন জায়গায় গিয়ে ভর্তি হবি। তাই বলে অন্যায় দেখব, আর চুপচাপ করে হজম করব তাই কি হয়? বরং শাপে বর হবে। সুন্দরবনে পোস্টিং হলে সবাই চায় কত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বদলি হওয়া যায়।

--না, তুমি বদলি নিও না। এ জায়গাটা আমার ভালো লেগে গেছে।

—কেন রে? তোর বিদিশা অন্টিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না,তাই তো?

—ঠিক তাই।

--ঠিক আছে, আমি একটা অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করছি। দেখা যাক, এ লড়াইয়ে জিতি, না হারি!

—তারপর যদি হেরে যাও!

--লড়াইয়ে হারজিত থাকেই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বলে শেষপর্যন্ত শুভশক্তিরই জয় হয়।

—বাবা, আমি কিন্তু বিদিশা আন্টিকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

৪০

হোস্টেলে কোনও কোনও খাবার নিতে রাত হয়ে যায়। তখন ঝিঁঝিবাবুরা তার স্বরে চিৎকার করে জানান দেন, 'আর কতক্ষণ জাগবেন আপনারা?' সেরকমই একটি রাতে বিদিশাকে ডেকে গেছে রসমতী, 'দিদিমণি, ভাত বাড়ছি, খেতে আসুন', ঠিক সেই সময় হোস্টেলের বাইরের দরজায় কারও হস্তধ্বনি। বিদিশা আজকাল চমকে ওঠে এরকম মুহূর্তগুলিতে। নক্ষত্রকে তারপর আর একদিনও দেখেনি, কিন্তু তার অস্তিত্ব টের পায় মাঝেমধ্যে। টিঙ্কুই প্রায়ই জানায় তাদের বাড়ি নক্ষত্র এসে এটা-

ওটা বলে বাবার কাছে, আর কিছু না কিছু খেতে যায়। আর বলে, 'যার জন্য এসেছি তাকে না নিয়ে ফিরব না।' কথাটা বলেই টিঙ্কু জানতে চায়, কাকে নিয়ে যাবে আন্টি?

বিশেষ করে রাতের বেলা কোনও ভিজিটর এলে চরম আতঙ্কিত হয় বিদিশা। তবে কি নক্ষত্রই--

রসমতী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলে এসে জানায়, সিক্রেটারিবাবু।

তা হলে নিমেষ মিত্র, নক্ষত্র নয়। কিন্তু এত রাতে বিদিশাকে কেন খোঁজ করছেন সেক্রেটারি তা তার কাছে আর এক অস্বস্তি। বেরিয়ে আসতেই শোনে নিমেষ মিত্রর ক্রুদ্ধ গর্জন, কী ব্যাপার, আপনি এসে কী আরম্ভ করেছেন? আপনি টিচার। ছাত্রীদের পড়াবেন। হঠাৎ দেশসেবা করতে কে বলল আপনাকে?

--দেশসেবা! বিদিশাকে বিস্মিত করে। দেশসেবা কোথায় করছি! একটি বাচ্চা ছেলের জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার চেষ্টা করছি।

—কিন্তু স্কুলের পড়ানোয় ফাঁকি দিয়ে!

বিদিশার অভিব্যক্তিতে প্রবল ক্রোধ। হয়তো মার খেতে খেতে একসময় ঘুরে দাঁড়ায় মানুষ, বলল, আমি যে ছাত্রীদের পড়াই সে খবর নিশ্চয় আপনি রাখেন? পড়ায় ফাঁকি দিয়ে নিশ্চয় দেশসেবা করি না।

--দেশসেবা তো আর করছেন না। করছেন রাজনীতি।

বিদিশা অবাক : রাজনীতি?

—হ্যাঁ। সেদিন এম এল এ এসে বললেন, নিমেষবাবু এ সব কী শুনছি?

--কিন্তু আমি এম এল এ-কে তো কোনও কথা বলিনি।

—আপনি বয়েজ স্কুলের বাংলার টিচার সৌম্যবাবুকে বলেছেন। তিনি বলেছেন ইতিহাসের টিচার দ্বৈপায়নবাবুকে। দ্বৈপায়নবাবু এখন বিষয়টা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন। এম এল এ-র কানে তুলে দিয়েছেন বিষয়টা।

--কিন্তু একটি আদিবাসী ছেলের স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে রাজনীতি কেন হবে তাও তো বুঝতে পারছি নে!

--আপনি খুব ভালোই বোঝেন ব্যাপারটা। জেনেশুনে রাজনীতি করছেন!

চেঁচমেচি শুনে পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে পৃথাও। বিদিশা ও পৃথাকে একসঙ্গে দেখে মুখ গনগনে হয়ে যায় তাঁর, আমার কাছে খবর আছে আপনারা স্কুলের ক্লাস কামাই করে বি ডি ও-র কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন!

বিদিশার মুখ লাল হয়ে যায়, পৃথার দিকে তাকায় এক বুক অস্বস্তি নিয়ে। সে শুধু নিজেই স্কুল ফেলে গিয়েছিল তা নয়, সঙ্গে নিয়েছিল পৃথাকে। যাকে বলে ডবল অপরাধ। বলল, বি ডি ও-র কাছে একটা কাজ ছিল।

—কী কাজ? নিমেষ মিত্রর জিজ্ঞাস্য খুব সামান্য, কিন্তু তাঁর স্বরে ঝাঁজ শুনে বিদিশা বোঝে বিষয়টা অসামান্যে বাঁক নিতে পারে।

নিমেষ মিত্র পরক্ষণে বলল, শুনলাম ম্যাডামদ্বয় আপনারা দুলির ছেলের ডি এন এ টেস্ট করাচ্ছেন?

বিদিশা গলায় দৃঢ়তা এনে বলে, হ্যাঁ, শুনলাম দুলির বর তাতে খুব উদ্বিগ্ন। রাতে তার ঘুম হচ্ছে না। ঘুমের ট্যাবলেট খাচ্ছেন রোজ।

নিমেষ মিত্রর মুখ লাল হয়ে যায়।

বিদিশা থামে না, চেঁচিয়ে বলে, আপনি যদি মনে করে থাকেন টিচাররা আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তা হলে ভুল করছেন। দরকার হলে আমরা উপরে গিয়ে এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করব।

—ঠিক অছে, দেখি আপনার কত সাহস!

—এতে আপনি কেন বিপদে পড়বেন?

নিমেষবাবু রেগেমগে বেরিয়ে যান সেখান থেকে, বলেন, কিন্তু এর পরিণতি কিন্তু ভালো হবে না।

তাঁর স্কুলের এক শিক্ষিকা জড়িয়ে পড়ছে গ্রাম্য রাজনীতিতে তা একেবারেই কাম্য নয় শাশ্বতী মিত্রর। একেই তো ভারি অশান্তিতে আছেন ছন্দিতাকে নিয়ে, তার উপর বিদিশা সদ্য বিজিতপুরে এসেছে, এখনও জানে না এখানকার রাজনীতি বা সমাজনীতির চোরাস্রোত। রাতের খাওয়ার পাট মিটে গেলে তিনি বিদিশার ঘরে ঢুকলেন পায়ে পায়ে। বিদিশা একটু চমকেই উঠল তাঁর দরজা খোলার শব্দ পেতে। কেন কে জানে মেয়েটা বারবার কীসের আতঙ্কে ভোগে, নিশ্চয় তা কোনও কারণ আছে, কিন্তু নিজের বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছে না বলেই শাশ্বতীর ধারণা। বিদিশা বিছানায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল, শাশ্বতীকে দেখে উঠে এল, বলল, আপনি কি ভয় পেয়েছেন, শাশ্বতীদি?

আস্তে আস্তে শাশ্বতী বলেন, বিদিশা, তুমি আর এ বিষয়ে এগিও না। গ্রামে কিছু অশুভ শক্তি থাকে, তাদের গায়ে আঁচড় পড়লে তাদের দাঁত নখ বেরিয়ে পড়ে। তুমি কলকাতায় মানুষ, সেই দাঁত নখের সঙ্গে লড়াই করার জোর তোমার নেই।

বিদিশা চুপ করে থাকে, কিছুক্ষণ পরে, বড়দি, আমি কিন্তু অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইনি। বাচ্চাটা যাতে লেখাপড়া করতে পারে তারই চেষ্টা করছিলাম।

—কিন্তু দুলি তো তার ছেলেকে হোমে রেখে পড়াতে চাইল না।

বিদিশা চুপ করে থাকে।

—তুমি আর এ বিষয়ে মাথা ঘামিও না।

—শাশ্বতীদি, স্বয়ং এস ডি ও নাকি আসছেন বিজিতপুরে।

—তাই নাকি? খুব মুশকিলে পড়ে যেতে পারো কিন্তু। তুমি জানো, এ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মিটিং হয়ে গেছে? বিভীষণ দাস এ নিয়ে খুব জল ঘোলা করতে চাইছেন। বলছেন, তাঁর স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি অভিভাবকদের উসকে দিচ্ছেন যাতে তারা সরব হয়, উপরঅলার চাপ এলেও যেন দুলির ছেলে কিছুতেই ভর্তি হতে না পারে। ব্যাপারটা এখন জড়িয়ে গেছে রাজনীতিতে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে! গ্রামের রাজনীতি কী ভয়ংকর তা তুমি এখনও জানো না।

বিদিশার মুখ কালো হয়ে যায়।

শাশ্বতী তাঁর মাথায় হাত বোলান, তোমার নিজের মনেই নানা অশান্তি, তুমি কেন আরও অশান্তি ডেকে আনছ বলো তো?

বিদিশা অবাক হয়ে তাকায় শাশ্বতীদির দিকে।

শাশ্বতী বলেন, এ পাপ এদের জীবন থেকে যাওয়ার নয়। দেখতেই পাচ্ছ কিছু কিছু লোক প্রবল অর্থবান ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তারা পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে নানা অনর্থ ঘটায়। সব লোকই যে খারাপ তা নয়। কিন্তু কিছু খারাপ লোক বাকিদের জীবনে অনর্থ ঘটায়। তারা জানে কেউ তাদের গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না।

বিদিশাকে একগলা অস্বস্তির মধ্যে রেখে শাশ্বতী ফিরে যান তাঁর ঘরে।

৪২

দিনদিন টেনশনে দোমড় হয়ে যাচ্ছিল বিদিশা, একেই তো খবর পাচ্ছে নক্ষত্র এলোমেলো ঘুরছে বিজিতপুরে, কিন্তু টমাস নাকি কী সব বলেছে তার কারণে সে মুখোমুখি হচ্ছে না বিদিশার। কিন্তু বিদিশার আশাও ছাড়েনি তাই বিজিতপুর ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছে না। তার উপর দুলির ভর্তি নিয়ে বেশ তেতে উঠছে এলাকা।

সবাই এখন বলছে দুলিই খারাপ মেয়েছেলে, এ সব ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে মেয়েদের জীবনে। অথচ দুলির অসহায়তার কথা গুরুত্ব দিচ্ছে না কেউই।

এমন সব সাত-সাতাশ ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল ইঁটখোয়া বিছোন পথ দিয়ে, হঠাৎ গায়ের কাছে ভ্যানরিকশ ব্রেক কষতে ভীষণ চমকে ওঠে বিদিশা। তাকিয়ে দেখে রিকশ থামিয়ে নেমে এলেন সৌম্য রায়। বললেন, ম্যাডাম, আপনি যে

কবিতাগুলো দিয়েছিলেন, খুব ভালো। আপনি এত ভালো কবিতা লেখেন তা ভাবতেই পারিনি।

বিদিশা বিব্রত বোধ করে।

—কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে। কলকাতার পত্রিকায় ঠিক এই নামে একজন কবিতা লেখেন। বরং আপনি নিজের নামে লিখুন না!

বিদিশা বিস্মিত হয়, তা হলে কি শাশ্বতীদি কলকাতার পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লেখেন? তার নিজেরও মনে পড়ছে শাশ্বতী মিত্র নামের এক কবির কবিতা ছাপা হয়, এতদিন খেয়াল হয়নি, সৌম্য রায়ের কথায় মনে পড়ে যায় হঠাৎ। এমন হতে পারে শাশ্বতীদিই সেই কবি, কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলে নিজের সেই পরিচয় লুকিয়ে রাখেন হয়তো স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তাঁর কবিপরিচয়ের কী প্রতিক্রিয়া হবে তাই ভেবে।

—না না, এও তো হতে পারে সেই কবিরই কবিতা এগুলো।

—তার মানে কি আপনিই সেই কবি?

--এই বিষয়টা একটু রহস্যের মধ্যেই থাকুক না। বিদিশার হাসি এই মুহূর্তে বেশ রহস্যময়।

—ম্যাডাম, আমারও মনে হচ্ছিল সেই শাশ্বতী মিত্র আর এই শাশ্বতী মিত্রর কবিতা একই ধাঁচের। আপনি কিন্তু বেশ ভালো কবিতা লেখেন। আপনাকে আমরা একদিন বিজিতপুরের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেব।

বিদিশা ছটফটায়, বলেন কী!

--ম্যাডাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—এই একটু গ্রামপ্রধান জনার্দনবাবুর বাড়ি।

—চলুন না আমার রিকশয়। আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি।

বিদিশা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ে ভ্যানরিকশয়।

রিকশ চলতে থাকে।

৪৩

লালিমাদির ঘরে হইচই শুনে বিদিশা হাজির। লালিমাদির স্বামী এসেছেন। পৃথা খুব ইয়ার্কি দিচ্ছে তাঁদের সঙ্গে। বেশ চমৎকার মানুষ অভিজিৎ চ্যাটার্জি। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্মল আনন্দ সেরে নিজের ঘরে ফিরে এল একটু রাত করেই।

আড্ডাটা দিয়ে ভালোই লাগছিল তার। এখানে আসার পর থেকেই জড়িয়ে পড়ছে নানা ঝামেলায়। হঠাৎ সেই জটিল আবর্তে একটু সুস্থতা। কিন্তু তার সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তার ঘরে আসেন ঐশীদি।

ঐশীদি : বিদিশা, শুনেছ, তোমার নামে পোস্টার পড়েছে?

বিদিশা হতভম্ব : কেন?

--ওই যে সেদিন তুমি বয়েজ স্কুলের বাংলার টিচার সৌম্য রায়ের সঙ্গে এক রিকশয় চড়েছিলে। তাই নিয়ে রাস্তার উপর পোস্টার। কী লিখেছে জানো?

--কী?

--একটা রিকশ এঁকে তাতে দুজন সওয়ারি এঁকেছে, তার নীচে লেখা : ইংরেজি-বাংলায় গা-ঘেঁসাঘেঁসি / প্রেমের জোয়ার বড্ড বেশি।

বিদিশা : কী সাংঘাতিক ওরা, হ্যাঁ?

--বড়দি বলছিলেন তুমি আর এ বিষয়ে এগিও না।

বিদিশা ফোঁস করে ওঠে, চারপাশে এত মরাল গার্জেন হলে তো খুব বিপদ!

৪৪

রাত অনেকটা ঘনিয়ে এসেছে, তখনও বাড়ি ফেরেননি টিঙ্কুর বাবা। তাদের বাড়ির কাজের মাসি রয়েছে তার পাহারায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কড়া নাড়া।

কাজের মাসি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন। টমাস ঘরে ঢুকে দেখেন টিঙ্কু একমনে পড়ছে টেবিলে বসে।

বাবাকে দেখে আরও জোরে জোরে পড়া শুরু করে দেয়। বাবা হেসে বলেন, কী রে, তুই মনে হচ্ছে দারুণ কিছু করবি এবার! যাক, এতদিনে মেয়েটার সুবুদ্ধি হয়েছে।

--বিদিশা আন্টি বলেছেন আমি ইচ্ছে করলে ফার্স্টও হতে পারি।

--তা তো পারিসই। শুধু এই যে শব্দটা, ইচ্ছে করলে। ইচ্ছে করলে তবেই।

--ইচ্ছে করলেই পারি?

--সিওর। কোনও মানুষ ইচ্ছে করলে তবেই সে এভারেস্টে উঠতে পারে। ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারে। আসলে তাকে তো প্রথমে ইচ্ছেটা করতে হবে। তারপর শুধু অনুশীলন আর জেদ। জীবনে বড়ো হওয়ার মূলমন্ত্র এটাই।

টিঙ্কু জোরে জোরে পড়া শুরু করে দেয়।

হঠাৎ পড়া থামিয়ে বলল, বাবা, বিদিশা আন্টির জন্য খুব মন খারাপ করছে।

--সে কী! এখন এই রাতের বেলা? কাল স্কুলে গেলেই তো দেখা হবে।

টিঙ্কু জোরে জোরে পড়তে থাকে ।

৪৫

বিদিশা : (মোবাইলে) কে মা, তোমরা কেমন আছো? আমি ভালাই আছি ফার্স্ট ক্লাস। গ্রাম যে এত ভালো তা জানতাম না। কী বললে?

মোবাইল বন্ধ করে বিদিশাকে চিন্তিত দেখায়।

ঐশীদি ঘরে ঢোকে, তার চোখে জল, বিদিশা, পৃথার বাবা মারা গেছে। এক্ষুনি ফোন এল।

বিদিশার চোখেও জল এসে যায়। দুজনে তাড়াতাড়ি পৃথার ঘরে ঢোকে। পৃথা বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। বলছে, বাবা, তোমার অসুখের খবর পেয়েও আমি যেতে পারিনি। বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

বিদিশা পৃথাকে, ডাকে, তুমি তৈরি হয়ে নাও, বেলা দশটায় একটা লঞ্চ আছে। আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?

পৃথা ঘাড় নাড়ে, না, দু-জনে একসঙ্গে গেলে ক্লাস চলবে কী করে? শাশ্বতীদির কথাও তো ভাবতে হবে।

পৃথা লঞ্চে যাচ্ছে। কিনারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে বিদিশা ও ছন্দিতা।

৪৬

স্কুলে গিয়ে দেখল টিঙ্কু বিদিশা আন্টি যথারীতি কোনও একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাকে দেখে হেসে বললেন, কী, রে, তোর মুখ এত শুকনো লাগছে কেন!

টিঙ্কু কথাই বলতে পারে না, তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে আসে ভীষণ। বিদিশা আন্টি অবাক হয়ে বলেন, কী হয়েছে রে তোর? অসুখ করেছে নাকি?

টিঙ্কু ঘাড় নাড়ে, না।

—তা হলে?

টিঙ্কু এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করার মতো শক্তি পায়, বলে, আপনি নাকি কলকাতায় চলে যাবেন?

—কে বলল তোকে?

—আমাদের ক্লাসের তুতুল বলছিল আপনি আর এখানে থাকতে পারবেন না।

বিদিশা স্তম্ভিত হয়, কেন থাকতে পারব না?

টিঙ্কু ঘাড় নাড়ে সে জানে না কেন।

কিছুক্ষণ পরে বলল, সত্যিই চলে যাবেন কলকাতায়?

-ধুর পাগলি।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে বিদিশা আন্টি হঠাৎ বললেন, আর যদি যেতে হয়ই তাতে কী হবে?

টিঙ্কুর মুখে কথা জোগায় না, তার মানে কথাটা সত্যি।

—দ্যাখ, কোনও কিছুই পৃথিবীতে চিরন্তন নয়। তোর বাবা যদি বদলি হন তা হলে তো তোকেও যেতে হবে অন্য স্কুলে পড়তে তাই না?

টিঙ্কু : বাবা বদলি নেবে না বলেছে।

বিদিশা অবাক : কেন রে?

—আমি বাবাকে বলেছি বিদিশা আন্টিকে আমি ছেড়ে থাকতে পারব না।

বিদিশা হাঁ করে চেয়ে থাকে টিঙ্কুর মুখের দিকে। বলে, সেই কারণে তোর বাবা চিরকাল সুন্দরবনে থেকে যাবে?

—বাবাকে বলেছি, তুমি চলে গেলেও আমি বাজিৎপুর ছেড়ে কোথাও যাব না।

বিদিশা তাকে কাছে টেনে নেয়, বলে, ধুর,তাই কখনও হয়? তোর বাবা কি তোকে ছেড়ে থাকতে পারবেন? তোরও কি উচিত হবে নাকি বাবাকে ছেড়ে থাকা!

টিঙ্কুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ। তার চোখ ফেটে জল আসতে চায়। হঠাৎই পালিয়ে আসতে গেল বিদিশা আন্টির চোখের সামনে থেকে। কিন্তু বিদিশা আন্টি তার অভিব্যক্তি দেখলেই বুঝে যান তার মনের কথা। সে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাকে ধরে ফেললেন চট করে। বললেন, তুই একটা পাগলি। এর জন্যে কি এত মন খারাপ করতে আছে! আমি না গেলে তুইও হয়তো এই স্কুল ছেড়ে নতুন স্কুলে চলে যাবি।

বলতে বলতে তাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। বললেন, দ্যাখ, একটা মানুষের জীবন কত বড়। তাকে সারা জীবনে কত জায়গায় যেতে হয়। কত মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। এখনকার ছেলেমেয়েরাও তো বাবা-মায়ের কাছ থেকে কত দূরে দূরে গিয়ে পড়াশুনো করছে। তারপর কোথায় না কোথায় চাকরি করছে। মেয়েরাও কত দূরে গিয়ে চাকরি করছে। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম।

টিঙ্কু তখন হু হু করে কাঁদছে দুহাতে মুখ ঢেকে। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর। বিদিশা আন্টি তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মুখটা চেপে ধরলেন তাঁর কাঁধে, বললেন, সব মানুষ কি সবার সঙ্গে চিরদিন থাকে! জীবনে কত মানুষ আসে, আবার চলে যায়। শুধু রেখে যায় তার স্মৃতি। এভাবে অজস্র স্মৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটা মানুষের জীবন।

টিঙ্কু আর শুনতে পারে না। সে জোর করে নিজেকে ছড়িয়ে ছুটে চলে যায়।

বিদিশা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

টিঙ্কুর কথাই ভাবছিল আনমনে, সেময় আর এক দুঃসংবাদ পায় রসমতীর কাছে। রসমতী ছুটতে ছুটতে আসে, দিদিমণি, আমি আমার দুলি আর বিল্লুকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

—খুঁজে পাচ্ছ না মানে?

আজ দুপুরে ছেলেকে নিয়ে নদীর ধারের দোকানটায় গিয়েছিল। তারপর থেকে এখনও ঘরে ফেরেনি।

বিদিশা : নিশ্চয় কোথাও গেছে। একটু পরেই আসবে।

—না দিদি, দুটো ছেলে নাকি মোটরবাইক চড়ে ঘোরাঘুরি করছিল। তারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে দুলি আর ওর ছেলেকে। কী হবে দিদি?

বিদিশা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলে, আমি দেখছি কী করা যায়। তার আগে তুমি থানায় গিয়ে জানাও এক্ষুনি। এফ আই আর করো।

রসমতী একমুখ আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকে বিদিশার দিকে।

৪৭

আতঙ্কের রেশ হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে হোস্টেলের ঘরে। থমথমে মুখে পৃথা এসে ঘরে ঢোকে, বিদিশা, তোমাকে বড়দি ডাকছেন।

বিদিশা খবরটা জানে, তার রোদশুকনো মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা।

শাশ্বতীদিও উদ্বিগ্ন, বিদিশা, শুনেছ দুলি আর ওর ছেলেকে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

বিদিশা ঘাড় নাড়ে, রসমতীর কাছে সব শুনলাম। রসমতীকে বলেছি থানায় জানাতে।

—থানায় জানিয়ে কিছু হবে মনে করেছ?

বিদিশা : বড়দি, আমি কিন্তু দুলির ভালোই চেয়েছিলাম।

শাশ্বতীদি: কিন্তু কী হবে বলো তো এখন? রসমতী এখন হোস্টেলের রান্নাও করতে চাইছে না। তোমাকে সবাই বলেছিল এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করতে।

বিদিশাকে অস্থির দেখায়। বলে, বড়দি, সে ক্ষেত্রে আমরাই না হয় রেঁধে নেব আজ। কিন্তু দুলিকে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। জলজ্যান্ত দুজন মানুষ উধাও হয়ে যাবে তা তো হয় না।

পৃথা বলে, বড়দি, আমাদের কিছু করা উচিত।

—তা কী করতে চাও?

—দুলিকে বিদিশা থানায় পাঠিয়েছে বিষয়টা জানাতে। নিশ্চয় পুলিশ এফ আই আর করবে। থানায় গিয়ে বাপারটা ফলো আপ করা উচিত আমাদের।

একটু পরেই ঐশীদি ঘরে ঢোকে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কী সব ঘটে গেল বলো? বাপারটা বেশ জটিল হয়ে গেল এখন।

বিদিশা : কিন্তু জটিল তো আমরা করিনি। যারা কালপ্রিট তারা ব্যাপারটা জটিলতর করেছে বলুন।

৪৮

টিঙ্কু তো বিদিশার এত সব টেনশনের কারণ জানে না, সে মুখে একশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বালিয়ে হাসল তার আন্টির দিকে তাকিয়ে, তার হাতে একটি ছোট্ট চারাগাছ। বলল, আন্টি, বাবা এই গাছটা পাঠিয়ে দিয়েছে স্কুলের লনে লাগানোর জন্য।

বিদিশার মন ভালো নেই, তবু টিঙ্কুর মুখে হাসি ফোটাতে বলল, বাহ্, এটা তো রঙ্গন। রঙ্গন লাগালে ফুলে ফুলে ভরে থাকবে লনটা। তোদের বাড়িতে বুঝি অনেক ফুলগাছ আছে?

—আছে, তবে সবই তো টবে। বাবা খুব গাছ ভালোবাসে। বাবা বলে বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা থাকলে তবেই মনে র মতো গাছ লাগানো যায়।

বিদিশা : যা বলেছিস!

টিঙ্কু : বাবা বলেছে আপনার লাগলে আরও গাছ দিতে পারে।

—তাই নাকি: তা হলে আরও কিছু রঙ্গন নিয়ে আসবি কাল?

—আনব, আন্টি।

—আনিস। তা হলে তো সামনের সিজনে লাল হয়ে থাকবে লনটা।

লালিমাদি কোথায় যেন যাচ্ছিল হন হন পায়ে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে দেখলেন দৃশ্যটা, বললেন, তুমি দেখালে বিদিশা। ওদিকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে বিজিতপুরে, আর তুমি কিনা গাছ লাগাচ্ছ স্কুল আলো করতে!

—তুলকালাম!

—কে যেন বলেছে একাদশী আর বিল্লুকে কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর জলে। সেই লাশ নাকি এখন পৌঁছে গেছে সমুদ্রে যাতে কেউ আর কোনও দিন ডি এন এ টেস্ট করতে পারে।

বিদিশা হৃৎপিণ্ডের কয়েকটা ভালভ যেন একযোগে বন্ধ হয়ে যায়, কী বলছেন, লালিমাদি?

লালিমাদি বেশ রাগত মুখে চলে যান স্কুলের দিকে। বিদিশা বহুক্ষণ কথাই বলতে পারে না, হঠাৎ কী মনে হতে মোবাইলে ধরার চেষ্টা করল বি ডি ও পর্ণা সান্যালকে।

ওপাশে হ্যালো শুনতেই বিদিশা : বিডিও ম্যাডাম বলছেন? আমি বিদিশা বলছি। সেই যে বিল্লু নামের একটি বাচ্চার কথা বলেছিলাম। স্কুলে ভর্তি হতে পারেছ না বলে আপনার কাছে গিয়েছিলাম সেই বাচ্চা আর তার মা কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ মিসিং। আপনি কিছু একটা করুন। বিজিতপুরে এ নিয়ে সাংঘাতিক টেনশন চলছে।

বি ডি ও-র উৎকণ্ঠিত স্বর। তাই নাকি? ঠিক আছে আমি থানার বড়োবাবুকে জানাচ্ছি এখনই।

বিদিশা তাঁর আশ্বাসে খুব একটা স্বস্তিতে থাকল তা নয়। সে ইতিমধ্যে বুঝে গেছে প্রশাসন যতটা করতে চেষ্টা করে, পারে না। তবু এই মুহূর্তে এর বেশি কী আর করতে পারে। সেই যে ছোটোবেলায় শুনত আগুন নিয়ে খেলা, এখন সেরকমই মনে হচ্ছে তার।

কিন্তু টেনশনের আরও বেশি বাকি ছিল তখনও। পরের দিন টিঙ্কু স্কুলে না-আসায় তার দুর্ভাবনা বহুগুণ। টিঙ্কুদের কোয়ার্টারের পাশেই তুতুলদের বাড়ি জেনে তাকে ডাকলেন কাছে, এই তুতুল, টিঙ্কু আজ স্কুলে অসেনি? কেন জানিস?

তুতুল : দিদি, ওর বোধহয় শরীর খারাপ।

--শরীর খারাপ? কেন, কী হয়েছে?

—বোধহয় জ্বর।

—বোধহয় বলছিস কেন? ঠিক জানিস নে?

--না, দিদি। ও তো এমনিতে কামাই করে না। তাই ভাবছি নিশ্চয় জ্বর।

কথাটা তুতুল খুব একটা খারাপ বলেনি। টিঙ্কু স্কুল থেকে তাদের বাংলোয় ফিরেই নাকি ছটফট করে কখন পরদিন স্কুলে যাবে, দেখা হবে বিদিশা আন্টিব সঙ্গে। সেই টিঙ্কু—

স্কুল ছুটি হতেই বিদিশা ঠিক করে সে টিঙ্কুদের কোয়ার্টারে যাবে খবর নিতে। কী জানি কেন তার মন বলছিল টিঙ্কুর শরীর ভালো নেই। পৃথা শুনে বলল, বিদিশা, একদম একা বেরোবে না। তোমার এখন অনেক শত্রু।

—তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

--না গো। আমার কয়েকটা খাতা দেখা বাকি। কাল না-দিলে শাশ্বতীদি রাগ করবে।

—তা হলে আমাকে একাই যেতে হবে।

কারও কথা না-শুনে বিদিশা হোস্টেল থেকে বেরোয় পথে। পথ সুনসান। কিন্তু টিঙ্কুর কথা ভেবে তার কেন যেন ভয় করছে না। পথে একটি মোটরবাইক দ্রুত তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার বুক কাঁপছিল। কিন্তু না, যা সে ভেবেছিল তা নয়।

কিছুক্ষণ পরে কাঠের তৈরি একটি বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, এক ভদ্রলোক পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, টবে জল দিচ্ছেন।

বিদিশা কিন্তু-কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করে, এটা কি টিঙ্কুদের বাড়ি?

ভদ্রলোক উঠে এলেন কাছে, হ্যাঁ। আপনি?

পরক্ষণে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত : আপনি নিশ্চয় বিদিশা আন্টি?

—ওহ্, আপনি নিশ্চয় টিঙ্কুর বাবা?

—হ্যাঁ। আমার নাম টমাস। টমাস জোন্স। আসুন, ভিতরে আসুন।

বিদিশা ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে টিঙ্কুর? আজ স্কুলে যায়নি কেন?

—ওর একটু জ্বর-জ্বর হয়েছে। তাও বায়না ধরেছিল স্কুলে যাবে বলে। আমি যেতে দিইনি।

—হঠাৎ জ্বর হল কেন?

টমাস গলা খাদে নামান, বললেন, সে এক কাণ্ড। কাল সন্ধের সময়, আমি তখনও অফিস থেকে ফিরিনি, কে একজন মোটর বাইক করে বাংলোয় এসে টিঙ্কুকে দেখে বলে গেছে, তোমার বাবাকে বোলো কাঠের নৌকোগুলো ছেড়ে দিতে। নইলে তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখান থেকে আর কেউ খুঁজে পাবে না।

বিদিশার পা জমে যায় মুহূর্তে।

—আরও কী বলেছে জানেন? বলেছে তোমার বিদিশা আন্টিকেও তুলে নিয়ে যাব।

বিদিশা কাঁপতে থাকে এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে।

—হয়তো সেই ভয়েই টিঙ্কুর জ্বর এসেছে। যাক সে সব কথা, টিঙ্কুর সামনে আর কিছু আলোচনা করব না।

বিদিশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে ঘরেব ভিতর। টিঙ্কু বিছানায় শুয়ে ছিল, বিদিশাকে দেখে লাফিয়ে উঠে আসে বিদিশার কাছে। এসেই তাকে জড়িয়ে ধরে।

বিদিশা: কই দেখি কত জ্বর?

—বেশি না, একশো।

—তাই বা কম কীসে?

টমাস: আর দেখুন না, পাগল মেয়ের কাণ্ড। একদিন স্কুল থেকে এসে বলল, বিদিশা আন্টি বিজিতপুর ছেড়ে চলে যাবে। বলে হাউহাউ করে কান্না।

বিদিশা টিঙ্কুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, বলে, তুই যে পাগলামিগুলো করছিস না, বড়ো হলে খুব মজা পাবি কথাগুলো মনে পড়তে। ছোটোবেলার অনেক ভালোবাসা বড়ো হলে আর মনের কোনায় স্থান পায় না।

টমাস বলেন, ঠিক তাই। অমিও ওকে বলেছি সে কথা। এগুলো সবই ছেলেমানুষি।

--এখন কয়েকদিন তা হলে টিঙ্কুর স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

টিঙ্কু বিদিশাকে আঁকড়ে ধরে, তুমি আজ থাকবে আমাদের বাড়ি?

-ধুর পাগলি। আমি বরং রোজই বিকেলে একবার করে আসব তোকে দেখতে।

বিদিশা উঠে পড়ে চা খেয়ে। টিঙ্কু হাসিমুখে বলে, ভাগ্যিশ আমি স্কুলে যাই নি। তাই তো আন্টি আমাদের বাড়ি এলেন, তাই না, বাবা?

টমাসের হঠাৎ কী মনে পড়ে, বলল, দাঁড়ান আন্টি, একা ফিরবেন না সন্ধের পর। আমি বাইকে করে পৌঁছে দি আপনার হোস্টেলে।

—না না থাক। একদিন সৌম্যবাবুর সঙ্গে একই ভানরিকশয় চেপেছিলাম বলে বাজারে পোস্টার পড়েছে। আবার আপনার বাইকে চড়লে—

টমাস হেসে বললেন, যাদের পোস্টার মারার অভ্যাস তারা তো একটা ছুতো খোঁজে। মারুক না পোস্টার।

বাইক থেকে নেমে বিদিশা হোস্টেলে ফিরতেই শাশ্বতীদি রাগ দেখালেন, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? পুলিশের ও সি এসে কতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন তোমার জন্য।

বিদিশার মুখে দুশ্চিন্তা। কী বললেন থানার বড়োবাবু?

--সে কি আমাকে বলবেন? বললেন, নদী পেরিয়ে আসা তো। একবার এসে ফিরে গেলে আবার কবে আসতে পারব কে জানে!

বিদিশা : তা আমার সঙ্গে কী কাজ তাঁর? তিনি তো খুঁজবেন দুলি আর বিল্লুকে।

—কী কাজ তা উনিই জানেন। তবে পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা এই প্রবাদবাক্যটি নিশ্চয় ভুলে যাওনি?

রাতটা বেশ দুশ্চিন্তায় কাটাল বিদিশা। টমাসদের বাংলোয় ফোন নেই। টমাস নিজেও মোবাইল রাখেন না বলে তাদের খবর নেওয়ার খুব অসুবিধে। স্কুলে গিয়ে টমাসের অফিসে একটা ফোন করে, কেমন আছে টিঙ্কু?

—ওর জ্বর সারেনি কমেনি এখনও। কাল রাতে একশো তিন জ্বর উঠেছিল।

বিদিশা চমকে উঠে, তাই নাকি? ডাক্তার কী বললেন?

--ওষুধ দিয়ে গেলেন। বললেন মেন্টাল শকে জ্বর হয় অনেক সময়।

—ঠিক আছে, আমি বিকেলে যাবখনে।

--একা আসবেন?

—কিছু হবে না। আমি অনেক মার খেতে খেতে এখন শক্ত হয়ে গেছি। কেউ আসুক না কাছে!

সেদিনও ফেরার সময় টিঙ্কু কিছুতেই ছাড়বে না। না আন্টি, আপনি আজ আমার কাছে থাকবেন। আপনি থাকলেই আমার জ্বর সেরে যাবে।

বিদিশা খুবই দোলাচলে। টিঙ্কুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে, কাল এসে থাকব। আজ তো কাউকে কিছু বলে আসিনি।

টমাস সেদিনও তাঁর বাইকে পৌঁছে দেন বিদিশাকে। আসার পথে হঠাৎ বলেন, জানেন, সেই পাগল-পাগল চেহারার লোকটা আবার এসেছিল।

বিদিশার বুকে দমকল, তারপর?

—টিঙ্কু আর আপনাকে হাইজ্যাক করবে শুনে কী উত্তেজিত। বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

বিদিশা কিছুক্ষণ স্তব্ধ। উন্মাদ লোকটি কী করতে চায় কে জানে! জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যবস্থা নেবে?

—কী জানি। তা বলল না।

৪৯

ঘরে ফিরে ভারি উদ্বিগ্ন থাকে বিদিশা। নীল আকাশে একটা ধোঁয়াটে মেঘের ছায়া ঘোরাফেরা করতে দেখে। রাতে তার চোখে ঘুম আসে না। টিঙ্কুকে নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে তার। মেয়েটাকে ক-দিন আগেও চিনত না, অথচ এখন তার সঙ্গে এমন এক মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছে—

টিঙ্কুকে নিয়ে তার উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার মধ্যেই আবার থানার অফিসারের হানা। পরদিন সকালেই থানার ও সি এসে বললেন, কী দিদিমিণি, আপনি তো সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়লেন!

বিদিশা গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যতিব্যস্ত আমি করেছি কেন বলছেন! করেছে এখানকার সমাজ। তাদের দিকে আঙুল তোলার সাহস নেই কেন আপনাদের?

থানার অফিসারের মুখ লাল হয়, বিদিশাকে নিরীক্ষণ করেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, বিষয়টা আমাকে খুলে বলুন কে আপনাকে থ্রেট করেছিল! কে-ই বা ওদের অপহরণ করেছে বলে আপনার মনে হয়?

থানার অফিসার বিদিশাকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন অনেকক্ষণ। উত্তর দিতে দিতে বিদিশা জেরবার, ছটফট করে বলে, বড়োবাবু, আপনিই পারেন দুলি আর তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে।

থানার অফিসার ঘাড় নাড়েন, দেখুন আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু কিডন্যাপ করে কোথায় ওদের রাখা হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না।

তিনি বিদায় নিলে হোস্টেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন শাশ্বতীদি, ঐশীদি, পৃথা। শাশ্বতীদির মুখ ভার, বললেন, তোমাকে তখনই বলেছিলাম এখানকার রাজনীতি অন্য রকম। কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবে না। মাঝখান থেকে তুমিই বদনামের ভাগী হয়ে যাবে।

বিদিশার চোখের সামনে তখন নীল আকাশ, তাতে কাটাকুটি খেলতে থাকে ক-টা এলেবেলে চিল। খেলতেই থাকে। নিজের মনেও কাটাকুটি খেলতে থাকে বিদিশা।

বিদিশা সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত শুনতে পায় রসমতী একটানা কাঁদছে তার মেয়ে ও নাতির কথা ভেবে। বিদিশা অস্থির হয়ে ওঠে। সমস্ত ঘটনার জন্য তাকেই দায়ী করছে এখানকার মানুষ, এমনকী তার সহকর্মীরাও। পৃথা তার ঘরে এলে বলে : সবাই আমার দিকে এমন চোখে তাকাচ্ছে যেন শুধু আমার কারণেই ঘটে গেল এই অঘটন। কিন্তু যারা প্রকৃত দোষী, তাদের কথা কেউ ভাবছে না কিন্তু।

পৃথা : তুমি তো বিডিওর সঙ্গে তো কথা বলেছিলে। কী বললেন উনি?

বিদিশা : বললেন তো দেখছি। তারপর থানার অফিসারও তো এসে ঘুরে গেলেন, জিজ্ঞাসার ঝড় বইয়ে দিলেন! কিন্তু কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছে না!

—তুমি বিডিও-কে আবার ফোন করো।

বিদিশা মোবাইলে বিডিওকে ধরে, ম্যাডাম, এখনও কিছু কিনারা হল না কিন্তু। আপনি কিছু একটা করুন।

ওপাশ থেকে পর্ণা : আমি এস ডি ও-কে বলেছি। উনি বোধহয় কাল বা পরশুর মধ্যে বিজিতপুরে যাবেন।

—এসডি ও-কে বলুন না যদি কালই আসেন। না হলে লোকে ভাববে প্রশাসন বলে কিছু নেই। এখানে তোলপাড় হচ্ছে দুলি আর দুলির ছেলেকে নিয়ে।

পর্ণার স্বরে উৎকণ্ঠা : ঠিক আছে, আমি এখনই বলছি।

বিদিশার অনুরোধ স্পর্শ করে পর্ণাকে যার জেরে পর্ণা ফোন করতে বাধ্য হন, আর তাঁর ফোনে কাজ হল কেন না পরদিনই বেলা দুপুরে এস ডি ও নামলেন বিজিতপুরের ঘাটে। বছর পঁয়ত্রিশের যুবক। সঙ্গে বি ডি ও এবং ও সি।

বিজিতপুরের বাতাসে সাড়া পড়ে যায় এতজন অফিসারের উপস্থিতিতে। বহু লোক ভিড় করে এল সেখানে। সবারই অভিব্যক্তিতে কী হয় কী হয়! বিদিশার দিকেই সবাইকার নজর। বিদিশার নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু ক-দিন ধরে তার মনে এতটাই টানাপোড়েন যে এ সময় তার শরীর ভরে সাহস জোগাল কেউ। এস ডি

ও-কে সব বলল বিস্তারিত; সে যেমন-যেমন বলছিল, এস ডি ওর নির্দেশে থানার বড়োবাবু লিখছিলেন তাঁর ডায়েরিতে।

একটু পরেই খোঁজ পড়ল স্কুলের সেক্রেটারি নিমেষবাবুর। হন্তদন্ত হয়ে নিমেষবাবু পটভূমিতে আবির্ভূত, বিনয়ের দশ অবতার হয়ে বললেন, স্যার আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে।

এস ডি ও বেশ কড়া গলায় বললেন, কিন্তু নিমেষবাবু, জগু সর্দার নামের লোকটির হয়ে আপনি তো বি ডি ওর কাছে তদ্বির ক'রেছেন অনেকবার।

--তখন করেছিলাম, স্যার। কিন্তু লোকটা এমন বজ্জাত তা জানতাম না। তা হলে আমি তার হয়ে তদ্বির করি? ছ্যা ছ্যা।

--দুলির ছেলের ভর্তির ব্যাপারে আপনি কি নাক গলাচ্ছিলেন?

নিমেষ মিত্র একবার আড়চোখে তাকালেন বিদিশার দিকে, পরক্ষণে বললেন, কই, না তো।

--কিন্তু আপনার উপর আমরা ওয়াচ রাখছি। এখন আপনি যান। দরকার হলে থানার অফিসার ডাকবেন আপনার স্টেটমেন্ট নিতে।

এস ডি ও ও সি-কে বকলেন, এখনও অ্যারেস্ট করতে পারলেন না জগু সর্দারকে?

--স্যার, চোরাকাঠুরেরা কী যে ডেঞ্জারাস তা নিশ্চয় জানতে বাকি নেই আপনার। জঙ্গলের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে।

--তা আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন। কিন্তু তা জেনেও তো আপনাদের কাজ করতে হয়। ব্যাপারটা সিরিয়স। আপনি দেখুন কত তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন তাদের।

--আপনি কি জানেন স্যার, টমাস জোন্স দু-দিন টুঁড়ে ফেলেছেন সুন্দরবনের আঁতিপাঁতি, কিন্তু চোরাকাঠুরেদের দেখা পাননি?

এস ডি ও এবার অসহিষ্ণু, ধমকের সুরে বললেন, তাই বলে তাদের আর কোনও দিনই ধরা যাবে না তাই কি হয়? আপনি ধরতে না চাইলে তাদের ধরা যাবে কী করে? আমি তিনদিন সময় দিয়ে গেলাম, তার মধ্যে অ্যারেস্ট না করতে পারলে--

ও সি ঘাড় হেলিয়ে বললেন, ঠিক আছে স্যার, তিনদিনের মধ্যেই ধরে দেব।

--দুলি আর তার ছেলেকে না ধরতে পারলে--

--ঠিক আছে, স্যার।

এস ডি ও লঞ্চে উঠে ফিরে গেলেন বিকেলের দিকে।

৫০

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে বেরোনোর সময় বিদিশা জানায় শাশ্বতীদিকে, শাশ্বতীদি, আজ রাতে আমি একটু টিঙ্কুর কাছে থাকব। ওর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ।

শাশ্বতীদি ঘাড় নাড়লেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মুখ থমথমে। বিদিশা কখন কী করছে তিনি বোধহয় বুঝে উঠতে পারছেন না। বললেন, জানো, নিমেষবাবু এসেছিলেন হোস্টেলে। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ। বললেন, আগে জানলে বিদিশাকে আমরা স্কুলে জয়েন করতে দিতাম না।

বিদিশার এখন আর কাউকে ভয় পাওয়ার নেই, বলে, শাশ্বতীদি, আমারও মনে হচ্ছে তখন উনি এখানে জয়েন করতে না-দিলেই ভালো হত। এত দুর্নাম হত না আমার।

স্কুল থেকে টিঙ্কুদের বাড়িটা অনেকখানি পথ। একটু নির্জনও। বিদিশার গা ছমছম করতে থাকে সারাটা সময়। কিন্তু টিঙ্কুর উপর কী এক আকর্ষণে তার শরীর থেকে ভয় শব্দটা উধাও। তবু ইঁটখোয়ার পথ বেয়ে যাওয়ার সময় সে নজর রাখে দু-পাশের ঝোপঝাড়ের দিকে। হঠাৎ খসখস শব্দ হতেই টানটান হয়ে ওঠে তার শিরদাঁড়া। কিন্তু প্রতিদিনই সে নির্বিঘ্নে হাজির হয় সেই বাংলোবাড়িটার সামনে।

টিঙ্কুদের বাড়ি গিয়ে বিদিশা আরও উৎকণ্ঠিত। টিঙ্কুর জ্বর বেড়েছে আরও। সারাক্ষণ অচেতন হয়ে ভুল বকছে। বিড়বিড় করে কিছু বলছে তা বুঝে উঠতে পারছে না বিদিশা।

টমাস বললেন, ভালো করে শুনুন, বলছে, বিদিশা আন্টিকে চলে যেতে দেবই না।

বিদিশার মন খারাপ হয়ে যায়। এ কী এক আশ্চর্য বন্ধন তাকে বেঁধে ফেলল বিভুঁয়ে চাকরি করতে এসে। অন্যমনস্ক হয়ে জলধারানি করতে থাকে টিঙ্কুর মাথার কাছে বসে।

কিছুক্ষণ পর টিঙ্কু চোখ খোলে। বিদিশাকে দেখে তার মুখে অদ্ভুত হাসি। তাকে আঁকড়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো, আন্টি ?

সেই রাতটা বিদিশার না-ঘুম কেটে গেল টিঙ্কুর পাশে বসে। টমাস বলছিলেন তার জন্য আলাদা বিছানা করে দেবে। কিন্তু বিদিশা বলে, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমার রাতজাগা অভ্যাস আছে। আজকাল রাতে প্রায়ই ঘুম হয় না আমার।

বিদিশা সারা রাত ঠায় জেগে বসে থাকে টিঙ্কুর মাথার কাছে। টিঙ্কু চোখ বুজে অবার কী যেন বকতে শুরু করে। হঠাৎ-হঠাৎ 'আন্টি আন্টি' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে।

বিদিশা কখনও হাত বুলিয়ে দেয়, কখনও জলের ধারানি করে, কখনও তার

জিভে থার্মোমিটার দেয় জ্বর নামল কি না জানতে। সত্যিই তার চোখে সারা রাত ঘুম নেই।

অনেক রাতে স্থানীয় ডাক্তারকে কল দিলেন টমাস। তিনি পরীক্ষা করলেন টিঙ্কুকে। গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন এই ট্যাবলেটটা খাইয়ে। জ্বর না কমলে হাসপাতালে দিতে হতেও পারে।

টমাস ও বিদিশা সারা রাত জেগে বসে থাকে টিঙ্কুর পাশে।

পরদিন সকালে চোখ মেলে টিঙ্কু। তার জ্বর অনেকটা নেমে আসে।

চোখ খুলে টিঙ্কু কথা বলে, আন্টি, আপনি সারা রাত আমাদের বাড়ি ছিলেন? ইশ্, আর আমি ঘুমিয়ে কাটালাম! জেগে থাকলে সারা রাত আপনার সঙ্গে কত গল্প করতাম!

বিদিশা তার মাথায় হাত বোলায়, ইস, গল্প করতি! সারা রাত তুই যা খেল দেখালি!

টিঙ্কু : আন্টি আপনি বাবার সঙ্গে গল্প করেছেন?

বিদিশা : তুই বেহুঁশ হয়ে থাকলে আমাদের তখন আর গল্প আসে! তোর মুখের দিকে তাকিয়েই কেটে গেল এত বড়ো রাত!

টিঙ্কুর জ্বর কমেছে দেখে বিদিশা সকালে হোস্টেলে ফেরে। টিঙ্কু তখনও ছাড়তে চায় না তাকে। তাকে অনেক বুঝিয়ে তবে—

একটু পরেই পৃথা ঘরে ঢোকে, টিঙ্কু কেমন আছে, বিদিশা?

—এখন একটু ভালো। সারা রাত যা জ্বর গেল!

বিদিশা সব খুলে বলল সারা রাতের ঘটনা।

পৃথা শুনল সব। বলল, আসলে ওর মা নেই তো। তোমাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে এখন।

বিদিশার মুখ কাঁচুমাচু, কী জানি, আমারও খুব মায়া পড়ে গেছে ওর উপর। হয়তো ওর মা নেই বলেই।

ঐশীদি হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, বিদিশা, তুমি এসেছ! আমরা সারা রাত ভাবছিলাম তুমি ফিরলে না দেখে। তোমাকে বড়দি একবার ডাকছেন।

শাশ্বতীদিকে কাল অনেকটা গম্ভীর লেগেছিল বিদিশার, আজ অপেক্ষাকৃত সহজ, জিজ্ঞাসা করলেন টিঙ্কুর কথা। ডাক্তার দেখানো হয়েছে কি না তার খবর নিলেন খুঁটিনাটি। পরে আস্তে আস্তে বললেন, বললেন, এটা গাঁ-দেশ। একটু সাবধানে থেকো। লোকে ভুল ব্যাখ্যা করবে তোমার স্নেহের।

বিদিশার কোনও কুণ্ঠা নেই, সহজ গলায় বলল, বড়দি, আমাদের স্কুলের একজন ছাত্রী, তার মা নেই, তাকে সেবা করা যদি অপরাধের হয়, তবে এই অপরাধ আমি সারা জীবন করে যাব।

শাশ্বতীদির ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে গিয়ে সবে ঢুকেছে, হঠাৎ মোবাইলে মায়ের কণ্ঠস্বর, কী রে, তুই সারা রাত মোবাইল বন্ধ করে রেখেছিলি? আমি ফোন করে করে পাই না তোকে! কী হয়েছিল?

বিদিশা ঘটনাটা খুলে বলে মায়ের কাছে, মা, আমাদের একজন ছাত্রী, টিঙ্কু, তার কথা তোমাকে আগে বলেছি। তার খুব অসুখ। কাল সারা রাত তার মাথার কাছ বসেছিলাম। জানোই তো তার মা নেই। মোবাইল বাজলে পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই সুইচ অফ করে রেখেছিলাম।

—তোর শরীর ভালো আছে?

বিদিশা জানায় তার শরীর ভালো অছে, কিন্তু যা জানাতে পারে না তা হল তাব মন ভালো নেই।

৫১

স্কুলে যাওয়ার ঠিক আগে বিদিশার কাছে ছুটতে ছুটতে আসে রসমতী, দিদিমণি, আমার দুলি অর বিল্লু ফিরে এসেছে।

বিদিশার বুকের ভিতব উল্লাসের তুমুল স্রোত, কোথায় পাওয়া গেল ওদেব?

—থানার পুলিশ ধরে এনেছে ওদের।

বিদিশা তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলে চেঁচিয়ে, পৃথা, পৃথা, শিগগির শুনে যা। শাশ্বতীদি, শাশ্বতীদি, ঐশীদি, লালিমাদি—

কিছুক্ষণ রসমতীকে ঘিরে হইহই। ক-দিন রসমতী আসেনি, তাতেই হোস্টেলে অনশন হওয়ার উপক্রম। কিন্তু বিদিশার উপর দিয়ে যা ঝড় যাচ্ছে তা নিয়ে সবাই খুব চিন্তায় ছিল। এতদিনে একটু স্বস্তি।

সারাদিনে বেশ কয়েকবার টমাসকে ফোন করে টিঙ্কুর খবর নিয়েছে বিদিশা। টিঙ্কুর জ্বর আর আসেনি। কিন্তু সকাল থেকে সে আন্টি-আন্টি করে পাগল করে দিচ্ছে তার বাবাকে। টমাস জানালেন, কী করি বলুন তো। মেয়েটাকে কত বোঝাচ্ছি আন্টির কি সময় আছে তোর কাছে বারবার আসার! তা ও কিছুতে শুনবে না।

তারপর হঠাৎ বললেন, একটা খবর আছে, আপনাকে টেলিফোনে বলা ঠিক হবে না। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখনই—

বিদিশা উৎকণ্ঠিত হয়, কী খবর?

—সামনাসামনি বলব, মিস সেন।

বিদিশার কৌতূহল প্রবল হয়, বলল, আমি বিকেলে টিঙ্কুকে দেখতে যাব তখনই শুনব তা হলে।

বিদিশা সেদিনও বিকেলে টিঙ্কুকে দেখতে গেল, যাওয়ার সময় শাশ্বতীদিকে বলতেই বললেন, আজও কি রাতে তোমাকে থাকতে হবে ওদের বাড়ি?

বিদিশা হাসল ম্লান, মনে হয় না। তবে ফিরতে রাত হবে।

সেদিনও অনেক রাত পর্যন্ত টিঙ্কুর পাশে বসে থাক বিদিশা। অনেক-অনেক গল্প করে তার সঙ্গে। টমাস তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, তার মধ্যে ফুরসত খুঁজে কথা বলে যায় এক-একবার। মেয়েকে বোঝায়, তুই এত পাগলামি করলে চলে! আন্টির কাজ থাকে না?

টিঙ্কুকে হরসিলকস করে খেতে দিয়ে বিদিশা একসময় একান্ত হয় টমাসের সঙ্গে, কী হয়েছে বলুন তো?

—খুব দুঃসংবাদ আছে।

বিদিশার বুক কাঁপতে থাকে, কী হয়েছে?

—গোবিন্দ গোস্বামী নামের লোকটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না আর।

—তাই নাকি? বিদিশার শরীরে কী এক চোরাস্রোত।

টমাস তাকে বলতে থাকেন পাগল-পাগল লোকটির বিচিত্র কাহিনি। দুলি আর দুলির ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে, তার উপর তারা হুমকি দিয়েছে টিঙ্কু আর বিদিশাকে অপহরণ করবে, তাই শুনে লোকটি ক-দিন ধরে রাত বিরেতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিজিতপুরের এখানে-ওখানে। নদীর ঘাটেও দেখা যাচ্ছিল তাকে। তারপর হঠাৎ সে-ই আবিষ্কার করে বিজিতপুরের ঘাটের অদূরে একটি ভাঙা বজরা পড়েছিল বহুকাল ধরে, তারই ভিতর আটক করে রাখা হয়েছে দুলি আর দুলির ছেলেকে। বিষয়টা পুলিশও অনুমান করতে পারেনি। পাগল লোকটা পুলিশকে গিয়ে খবরটা দিতে তারা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। লোকটি পীড়াপীড়ি করতে পুলিশ কাল গভীর রাতে সেখান গিয়ে ধরে এনেছে দুলি আর দুলির ছেলেকে।

বিদিশার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। কোনও ক্রমে বলে, তারপর?

—তারপর সেই লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না বিজিতপুরে।

—তবে কি চলে গেছে এখান থেকে?

টমাস চুপ করে থাকেন, তারপর বলেন, বুঝতেই পারছেন যারা দুলি আর দুলির ছেলেকে অপহরণ করেছিল তারা খুব ছোটোখাটো অপরাধী নয়। হয়তো তারা জেনে গিয়েছিল পাগল লোকটিই তাদের ধরিয়ে দেওয়ার মূলে। হয়তো তারাই উধাও করে দিয়েছে লোকটাকে।

—জানা গেছে কারা করেছিল কাজটা?

—হ্যাঁ। যে-লোকটা পাহারা দিচ্ছিল পুলিশের হাতে ধরা পড়তে বলেছে তাকে নিয়োগ করেছিল নিমেষ মিত্র।

—কী সর্বনাশ! বিদিশা বহুক্ষণ নিশ্বাস নিতে পারে না যেন।

বহুক্ষণ পরে বলল, আমি জানতাম। কিন্তু তারাই কি পাগল লোকটাকে কিছু করেছে।

—যে-লোকটা ধরা পড়েছে সে বলেছে সে কিছু জানে না। তবে পাগল লোকটা যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে তা নিমেষ মিত্রকে সে জানিয়ে দিয়েছিল।

পাগল লোকটা যে নক্ষত্রই তাতে তার কোনও সন্দেহ থাকে না বিদিশার। বিদিশা কোনও বিপদে পড়বে তা অনুমান করে নক্ষত্র শত্রুর নিকেষ করে গেছে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

বিদিশার চোখ ভরে জল আসে। টমাসের কাছে সব কথা বলতে তার দ্বিধা থাকে না এরপর। একটু একটু করে বলে নক্ষত্র নামের লোকটির পাগলামির কথা। বলতে থাকে সে মিস সেন নয়, মিসেস--

বলতে থাকে কীভাবে তার দু-বছরের বিবাহিত জীবন নক্ষত্র ছিঁড়েছে টুকরো টুকরো করে। কীভাবে নক্ষত্রেব অতিসন্দেহবাতিকতা শেষ করে দিয়েছে বিদিশার বেঁচে থাকার শেষ ইচ্ছেটুকুও। কী'ভাবে এক সাধারণ অটোচালকের সঙ্গে বিদিশা হেসে কথা বলায় তাকে খুন করতে গিয়েছিল নক্ষত্র। তারপর জেলে, আবার জেল থেকে কীভাবে পালিয়ে চলে এসেছিল বিজিতপুরে।

টমাস সব শোনে, বলে, আমি বুঝেছি লোকটি ছিল ম্যানিয়াক গোছের। যারা ম্যানিয়াক তাদের উপর থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু তাদের ভিতব জগৎটা হয় খুব ভয়ংকর।

কিছুক্ষণ টমাস হঠাৎ বলে, বুঝতে পারছি আপনার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে ।

বিদিশা কিছু বলে না। টমাসই হঠাৎ বলল, জানেন, আমার সংসারটাও কীভাবে তছনছ করে চলে গেছে টিঙ্কুর মা। আমার চাকরিটা জঙ্গলের, ঘুরে বেড়াতে হয় এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে, অথচ সেই জীবনটা কিছুতেই পছন্দ হল না তার!

বিদিশা তার কিছুটা শুনেছে, সবটা নয়। সব শুনতেও চাইছিল না এই মুহূর্তে। শুধু বলল, জানি।

দুজনে কিছুক্ষণ নীরব থাকে। হঠাৎই তাদের নিজস্ব জগৎটা অন্যের কাছে উন্মোচন করে হয়তো হালকা হয় নিজের কাছে। পৃথিবীতে নিজের কথা বলার লোকও তো তেমন থাকে না। আজ বলতে পারল। মন খুলে, হৃদয় খুলে।

হঠাৎ টমাস আর বিদিশা কী করে যে এত কাছাকাছি হল তা দুজনের কেউই বুঝে উঠতে পারে না এই মুহূর্তে।

বিদিশা হঠাৎ বলে, জানেন, যখন সিদ্ধান্ত নিলাম এ জীবনে আর বিয়ে করব না, স্কুলের চাকরিটা পেয়ে যেতে কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম এ জীবনটা একাই

কাটিয়ে দেব বলে, তখন মা একদিন টেলিফোনে বলেছিলেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো ঠিক নয়।

টমাস তার কথায় ভারি আশ্চর্য হয়, বলে, আপনিও যে আমার ভাবনার প্রতিধ্বনি করলেন! টিঙ্কুর মা যখন আমাকে ছেড়ে, টিঙ্কুকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে গেল তখন আমারও মনে হয়েছিল মানুষকে আর বিশ্বাস করব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একজনের জন্য সমগ্র মানবজাতির উপর বিশ্বাস হারানো যায় না।

দুজনের এই আশ্চর্য নীরবতার মুহূর্তে হঠাৎই টিঙ্কুর ডাক শুনতে পায় বিদিশা। তাড়াতাড়ি ফিরে আসে ঘরে। টিঙ্কু কালকের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খুনসুটি করে বিদিশা তাদের রান্নাঘরে গিয়ে চা বানায়, টিঙ্কুর জন্য খাবার। সোফায় বসে চা খেতে খেতে গল্প করে। হঠাৎ টিঙ্কু বলে ওঠে, আন্টি যদি বরাবরের মতো আমাদের বাড়ি থাকতেন কী মজাই না হত, না বাবা?

বিদিশা বিষম খায়।

টিঙ্কু তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, তাই না বাবা?

টমাসও বিব্রত। পরে টিঙ্কুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ভালো নিশ্চয় হত। সব চাওয়াই কি আর পাওয়া যায়!

বিদিশার মুখ কী কারণে যেন লাল হয়ে ওঠে।

৫২

একমুখ আলো নিয়ে বিদিশা হোস্টেলে ফিরে আসে। হঠাৎ তার জীবনে এমন কিছু ঘটে যাচ্ছে যার নিয়ন্ত্রণ যেন তার হাতে নেই। পৃথাকে কিছু বলবে-বলবে করেও বলতে পারে না। সে রাতও তার জীবনের আর একটি না-ঘুম রাত। এক আশ্চর্য রাত।

কিছুতেই ঘুম আসছে দেখে বিদিশা উঠে পড়ে মাঝরাতে। আলো জ্বালিয়ে লিখতে শুরু করে তার ডায়েরিটা। সৌম্য রায় তাকে বলেছিলেন তার জীবনের ঘটনাগুলো যদি একটু একটু করে লিখে রাখে ডায়েরিতে, পরে তা জোড়া দিলেই লেখা হয়ে যাবে একটি উপন্যাস।

এটি উপন্যাস হচ্ছে কি না তা জানে না বিদিশা। সে প্রতিদিনই একটু একটু করে লিখে রাখে বিজিতপুরের প্রবহমান ঘটনাবলি। শিরোনামে লিখেছিল 'অভিশপ্ত অরণ্যে' শব্দদুটো। শিরোনামটা কাটবে কি কাটবে না এই ভেবে কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত। বুঝতে পারে না তার অভিশাপ কি সত্যিই কাটবে কোনও দিন!